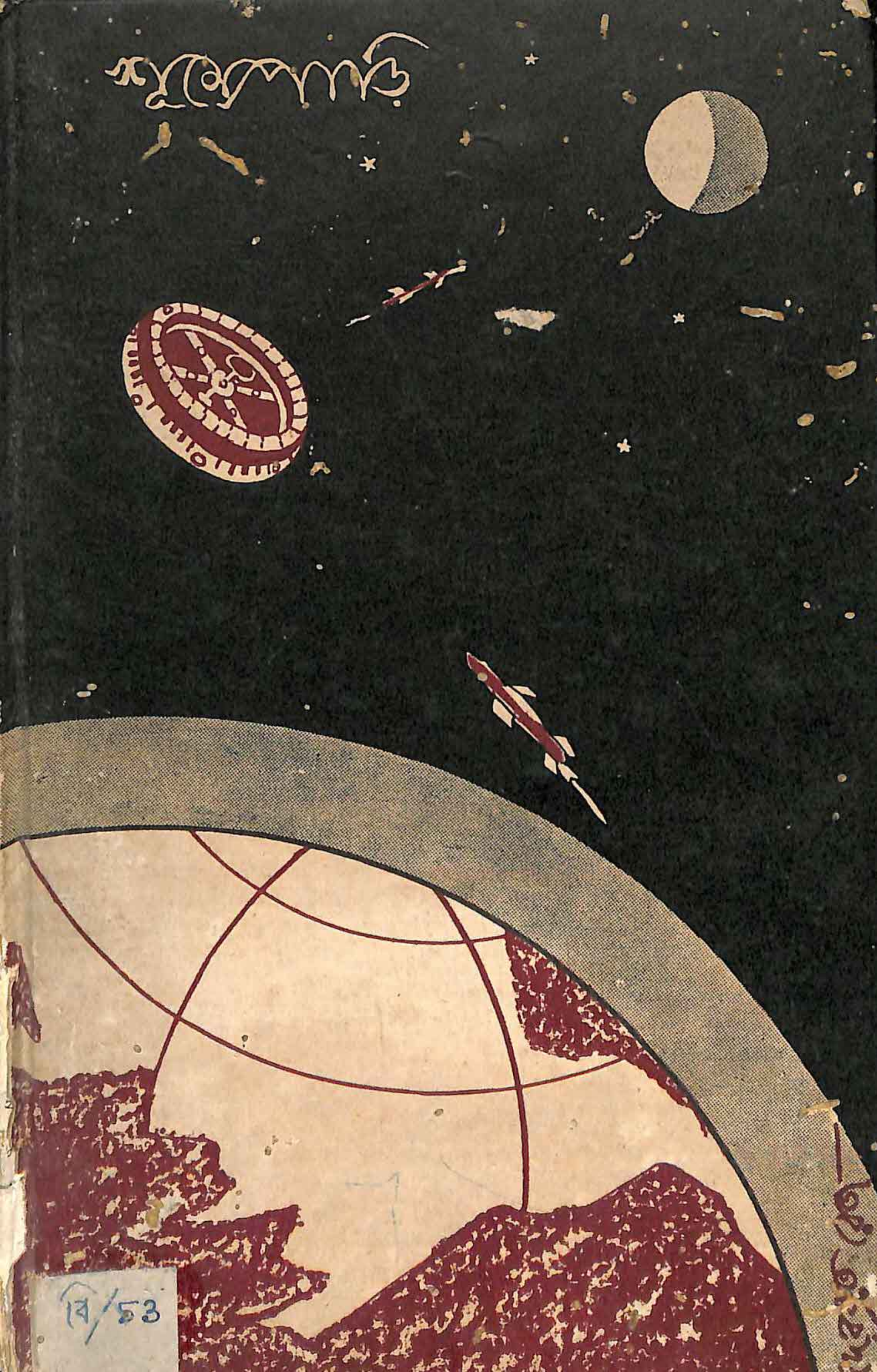


শূন্যে পাড়ি

দেবব্রত রেজ

চিনকো

১৬৭ এন, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ

কলিকাতা-১৯

প্রথম প্রকাশ ॥ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮

প্রকাশক
মণি বসু
চিনকো
১৬৭এন, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ১৯

প্রচ্ছদশিল্পী
সি. বাসু

মুদ্রক
শ্রীরথীন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী
ওরিয়েণ্ট প্রিণ্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড
৮১।৩, হরিশ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৫

তিন টাকা

অতীশ, অজয়, অসীম, অপূর্ব, প্রিয়জ,
প্রবীর, প্রণব, সংঘমিত্রা, কাবেরী,
কুন্তলা, কৃষ্ণা, দেবাশীষ, বিভাস

ও

এদের দাদাদিদিদের হাতে।

সত্যেন বোস

২২, ঈশ্বরমিল লেন,
কলিকাতা-৬

প্রীতিভাজনেষু,

'শূন্যে পাড়ি' পড়ে খুব ভাল লেগেছে। যে ভাবে বিজ্ঞানের কথা বল্‌লে নবীন মনে সাড়া দেবে, তার ছন্দ তুমি ধরে ফেলেছ।

শুধু একটা আমার জিজ্ঞাস্য, Von Braun কি সত্যিই মরেছেন? গত যুদ্ধের শেষে শুনেছিলাম তাঁকে আমেরিকানরা নিয়ে গেছে।

প্রথমে রকেটে যন্ত্রপাতি পাঠানো তাই মার্কিনে শুরু। দিল্লীতে '৪৪ সালে আমি শুনি যে সূর্যের কিরণের, বাতাসে শোষণের পূর্বে, বর্ণছত্র কি প্রকারের হয় তার অনুসন্ধানে আমেরিকা রকেটের মাথায় যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে ছবি তুলেছিল।

গুজব ওই সময়েই কয়েকজন জার্মানকে রুশরা ধরে নিয়ে যায়। সেই কটি নতুন ভাবের ভাবুক রাশিয়াতে অণুজগতের যুগ এনেছে।

প্রথমে অণুবোমা ফাটাবার পর বলেছিলেন আমেরিকানরা, যে এগুলি বন্দী জার্মান বিজ্ঞানীদের কাজ। আজ যে ভাবে বিপুল আকার ধারণ করেছে রাশিয়ার অভিযান, তার ফলে সেসব কথা চাপা পড়ে গেছে। যদি এই বিদ্যা প্রথমে জার্মানী থেকেই গিয়ে থাকে—তাহলেও স্বীকার করতেই হবে যে ওরা গুরু-মারা বিদ্যা রপ্ত করেছে। রুশ ভাষা যে শিখেছ এ বই তার একটা সাক্ষাৎ সুফল। তোমাকে অভিনন্দন জানাই। ইতি—

সত্যেন বোস



মহাশূন্যের প্রথম অভিযাত্রী
যুরি আলেক্সেয়েভিচ গাগারিন

॥ এক ॥

···বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং এসে তপস্যার ফলস্বরূপ তাঁকে রাজর্ষি করে গেলেন।

কিছুদিন পর রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাবার চেষ্টায় গুরু বশিষ্ঠ আর তাঁর পুত্রদের কাছে গেলেন; কিন্তু তাঁরা তাঁকে এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে রাজী হলেন না। তখন তিনি গেলেন রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের কাছে।

বিশ্বামিত্র শরণাগতবৎসল। অর্থাৎ যে তাঁর শরণ নেয় তাঁর প্রতি তাঁর অশেষ মমতা। ভিতরে ভিতরে অন্য ঋষিদের উপর টেক্কা দেওয়ার বাসনাও প্রবল। যাই হোক, তিনি একটা বিরাট যজ্ঞ করলেন। এই যজ্ঞের জোরে ত্রিশঙ্কুকে পাঠিয়ে দিলেন স্বর্গে, সশরীরে।

দেবতারা তা মানবেন কেন? মানুষের দেহ ধরে স্বর্গে হানা? তাঁদের চক্রান্তে তিনি স্বর্গ থেকে পৃথিবীর দিকে পড়তে শুরু করলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র ক্ষুব্ধ হলেন। ভাবলেন, বটে? তবে দেখ! এই না ভেবে তিনি নতুন ব্রহ্মাণ্ড তৈরি করে দিলেন স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝখানে—আর ত্রিশঙ্কুকে রাখলেন সেই নতুন ব্রহ্মাণ্ডে। দক্ষিণে তৈরি করলেন নতুন নক্ষত্রপুঞ্জ—ইচ্ছা, নতুন দেবতার জাত সৃষ্টি করবেন সেখানে।

দেবতারা তো ভয় পেয়ে সব ছুটে এলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কাছে। অনেক অনুরোধ উপরোধে শান্ত করলেন তাঁকে। তখন তিনি সেই নতুন দক্ষিণ নক্ষত্রদলে স্থাপন করলেন ত্রিশঙ্কুকে।···

সন্ধ্যের পর ছাদের ওপর বসে ঠাকুমা গল্প করছেন তারায় ভরা আকাশের দিকে চেয়ে। সুমিত্রা, অমর স্থির হয়ে বসে শুনছে। দুই ভাই-বোন। দুজনেই সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। সুমিত্রা গান গায় ভালো ; ছবিও আঁকে বেশ। অমর ছুরি কাঁচি হাতুড়ি সামনে যা পায় তা দিয়ে ঠুক্‌ঠাক করে। কয়েকদিন আগে দরজার একটা ছিটকিনি সারিয়ে দিয়ে খুব গর্ব করে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে সে ইঞ্জিনিয়ার হবে। গল্প এই পর্যন্ত পোঁছানোর পর সে হঠাৎ বলে বসল, আমরাও পারি!

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন, কি পারিস ?

—আমরাও গ্রহ তৈরি করেছি।

ঠাকুমা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কারা কি তৈরি করেছে বললি ?

—গ্রহ, তোমার নব গ্রহের উপর দশম গ্রহ। কেন, নাম শোন নি ঠাকুমা ?

ঠাকুমা কপালে হাত ঠেকিয়ে গ্রহদের উদ্দেশ্যে নমস্কার করে বললেন, ওসব কথা বলিস নে। গ্রহরা অসন্তুষ্ট হবেন।

—ছোটকাকামণিও এই রকম কি একদিন বলছিল মা-মণিকে! সুমিত্রা বললে।

অমর উৎসাহিত হয়ে বললে, আমিও তো তার কাছে শুনেছি। এই নতুন গ্রহের নাম 'লুনিক'। জানো ঠাকুমা, রাশিয়া বলে একটা দেশ আছে, সেখানকার বিজ্ঞানীরা এটা তৈরি করেছেন। একজন বৈজ্ঞানিকের নাম আমার মনে আছে,—'ব্লাগনরাভভ'!

ঠাকুমা বললেন, তোরা কত কি জেনেছিস এইটুকু বয়সে, বল্ না বুঝিয়ে কেমন করে কারা করলে এসব ?

সুমিত্রা বললে, দাঁড়াও, ছোটকাকামণিকে ডেকে আনি!

—ঠিক, ঠিক! কাকামণিকেই ডাক্, অমরও উৎসাহিত হয়ে বলে।

ঠাকুমা বললেন, এতদিন আমরা, ঠাকুমারা, নাতিনাতনীকেই গল্প শুনিয়েছি, এবার তোরা আমাদের গল্প শোনা!

অমর বললে, না ঠাকুমা, গল্প নয়, সত্যি! একেবারে সত্যি! ছোটকাকামণি নিজের কানে তার শব্দ শুনেছে, সেই গ্রহ যখন অনন্ত শূন্যে উঠে যাচ্ছিল!

ঠাকুমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, অনন্তশূন্যে!

অমর উৎসাহের সঙ্গে বললে, এই অনন্তের খানিকটা মানুষ জানতে পেরেছে, বলছিল কাকামণি।

—এই যে! কি জন্যে ডাক পড়েছে, মা? বরেন ছাদে এসে জিজ্ঞাসা করলে।

—এই, তোর কাছে নতুন গ্রহের গল্প শুনবে এরা, তাই আমার নাম করে তোকে ডেকে এনেছে।

—তুমি শুনবে না?

—আমি? হ্যাঁ, আমিও শুনব। তুই কি কাজ করিস তা তো জানি নে। লোকে বলে, তুই বিজ্ঞানের কাজ করিস! তা নিয়ে কি সব লেখাপড়া!

—কি নাম তোমার পড়ার সাব্‌জেক্টের, কাকামণি? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—অ্যাস্‌ট্রোফিজিক্স

—মানে কি?

—মানে নক্ষত্রবিজ্ঞান।

—তুই এই পড়তে বাইরে যাচ্ছিস বুঝি? জিজ্ঞাসা করেন মা। বরেনের আমেরিকা যাবার কথা আছে কয়েক মাসের মধ্যে।

—না মা, ঠিক এই বিষয় পড়তে যাচ্ছি নে, পড়তে যাচ্ছি নতুন একটা বিজ্ঞান—ইংরেজীতে তার নাম Space science—বাংলায়, মহাকাশ বিজ্ঞান।

অমর মা-ছেলের মধ্যে এসব আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে কাকামণিকে আসল আলোচনায় টানতে চাইলে।

—বল না কাকামণি, এই দশম গ্রহটার কথা।

বরেন বলতে শুরু করলে।

—১৯৫৯ সালের ২রা মে। রাশিয়ানরা ছুঁড়লেন নতুন রকেট। প্রথম নামকরণ হলো লুনিক—অর্থাৎ চাঁদে পৌঁছানোর রকেট—'চান্দ্রিক'।

প্রথম নাম তারা অল্প দিনের মধ্যেই বদলে দিলে। নাম রাখলে 'মেচ্‌তা' অর্থাৎ 'দিবাস্বপ্ন'। দিবাস্বপ্ন বইকি! মানুষের বহুদিনের স্বপ্ন, শূন্যবিহার! সেই স্বপ্ন দিনের আলোয় স্পষ্ট সত্য হয়ে দাঁড়াল।

—কবে থেকে মানুষ এই স্বপ্ন দেখছে?

—পরে বলছি! 'চান্দ্রিক' কিন্তু চাঁদের কাছাকাছি গিয়ে দিক বদলে হয়ে গেল সূর্যের উপগ্রহ—পৃথিবীর মতো!

—কত কাছাকাছি কাকামণি?

—৪৬৬০ মাইল।

ঠাকুমা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এটাকে তুই কাছাকাছি বললি?

—হ্যাঁ মা খুব কাছে, আকাশের দূরত্বের মাপ আলোক-বৎসর।

অমর প্রশ্ন করে, 'আলোক-বৎসর' কি কাকামণি?

—সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল্ বেগে এক বৎসর চললে যতটা পথ যাওয়া যায় সেই পথের দূরত্বটা এক আলোক-বৎসর।

—কি ভয়ঙ্কর মাপ! বলে ওঠেন ঠাকুমা।

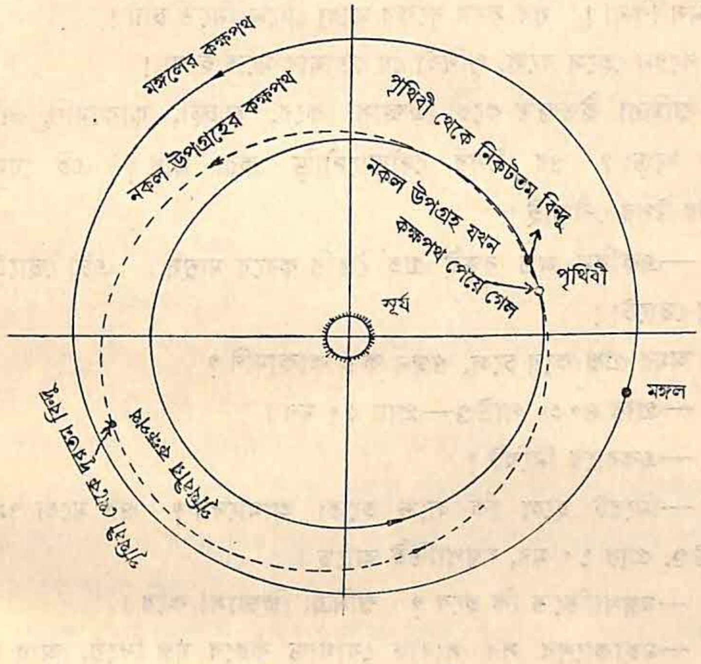
অমর প্রশ্ন করে, তারপর কি হলো কাকামণি?

—তারপর থেকে 'চান্দ্রিক' বা 'দিবাস্বপ্ন' সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে শুরু করলে।

—সূর্য থেকে কতদূরে?

—সবচেয়ে কাছে যখন, তখন দূরত্ব হবে ৯ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল। সব চেয়ে দূরে যখন, তখন তার দূরত্ব হবে ১২ কোটি ২০ লক্ষ মাইল।

—গ্রহ যখন, তখন তো ওর 'বৎসর' আছে? যেমন পৃথিবীর বৎসর ৩৬৫ দিনে!



নকল উপগ্রহের সূর্য প্রদক্ষিণ পথ

—আছে বইকি! ওর বছর হিসেব করা হয়েছে ৪৪৭ দিনে। আমাদের পাঁচ বছর পরে ওর চার বছর পেরিয়ে যাবে। হিসেব করে দেখা গেছে, ১৯৬৪ সালের পয়লা জানুয়ারী এই রকেট আবার পৃথিবীর কাছাকাছি এসে যাবে।

—তখন যদি টুপ করে পৃথিবীতে পড়ে যায়?

—পড়ে যদি তো টুপ্ করে পড়বে না, পড়বার আগে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

—ছাই হবে কেন? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুমা।

—সময় মতো সব কথাই বলব। তবে সম্ভবতঃ পড়বে না। হয়তো কক্ষপথ বদলে যাবে পৃথিবীর টানে।

ঠাকুমা হেসে বলেন, পৃথিবীর কি মায়া দেখলি? নিজের জিনিস কিনা! সব সময় বুকের মধ্যে টেনে নিতে চায়!

বরেন হেসে বলে, পৃথিবী যে তোমার মতোই মা!

সুমিত্রা ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, কাকামণি, ওটা কত বড়ো? ওর উপর দৌড়াদৌড়ি করা যায়? এই যেমন মাটির উপর দৌড়াই!

—একদিন অত বড়ই গ্রহ তৈরি করবে মানুষ। এটা ছোটো, বেশ ছোটো!

অমর প্রশ্ন করে চলে, ওজন কত কাকামণি?

—প্রায় ৪০৩০ পাউণ্ড—প্রায় ৫০ মণ।

—একবারে নিরেট?

—নিরেট হলে কি লাভ হতো আমাদের? ওর মধ্যে ৭৯৭ পাউণ্ড, প্রায় ১০ মণ, যন্ত্রপাতিই আছে।

—যন্ত্রপাতিতে কি হবে? সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে।

—মহাকাশের সব সংবাদ যোগাড় করবে যন্ত্র দিয়ে, আর যন্ত্র দিয়ে জানিয়ে দেবে আমাদের।

—আকাশের কি আবার সংবাদ? ওতো শূন্য—যার মাঝে কিছু নেই; শুনেছি খুব উপরে হাওয়াও নেই। তবে কিসের সংবাদ জানবে মানুষ?

—আজ তোদের সব বলব। অনেক কিছু জানবার আছে। যা না জানলে মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার সমস্যার পূর্ণ সমাধান হবে না কোনোদিন। যেমন সাগরে ডুবুরি নামিয়ে দেওয়া হয়

অতলে কী আছে জানতে, তেমনি আমরাও ডুবুরি নামিয়েছি মহা-শূন্যে। যন্ত্রের ডুবুরি। কত জ্ঞানের মণিমুক্তো আনবে কুড়িয়ে।

—যন্ত্র তো আছে, কিন্তু চালায় কে? প্রশ্ন করে অমর।

বরেন হেসে বলে, আপনিই চলে। যন্ত্র যন্ত্রকেই চালায়। কতকগুলো যন্ত্র আছে যাদের কাজ চালিত হওয়া, আর কতকগুলো যন্ত্র আছে যাদের কাজ চালনা করা।

ঠাকুমা আপন মনে বলেন, কী আশ্চর্য! মানুষের মাথা আর ধড় যেমন!

—হ্যাঁ মা, মানুষই তৈরি করছে আরো এমনি যন্ত্র। যন্ত্রের মস্তিষ্ক আর যন্ত্রের স্নায়ুতন্ত্র। বলবো সে-কথা আরেক দিন।

—আমি কি ভীষণ অবাক হয়ে গেছি কাকামণি, মনে হচ্ছে যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁরা মানুষ নন, বলে ফেলে সুমিত্রা।

ঠাকুমা মন্তব্য করেন, বিশ্বামিত্রের মতো মুনি ঋষি!

—না, মা, তারা আমার মতো, অমরের মতো, সুমিত্রার মতোই মানুষ!

অমর প্রশ্ন করে, কতদিন লেগেছে তৈরি করতে?

—কেউ বলবে কয়েক বছর, কিন্তু আমি বলব অনেক অনেক বছর লেগেছে। যখন বিশ্বামিত্রের কাহিনী তৈরি হয়েছে তার আগে থেকে এর রচনা শুরু!

—বল না কাকামণি, কেমন করে সম্ভব হলো? কবে থেকে শুরু?

—মানুষের এক একটা বৃহৎ আবিষ্কার এক একটা বৃহৎ নদীর মতো। ধারা ধরে ধরে উৎপত্তি খুঁজতে গেলে অনেক দূর পিছিয়ে যেতে হয় পাহাড়ে পাহাড়ে। অনেক দূর পিছিয়ে গেলে নদী আর নদী থাকে না, অনেক ছোট ছোট ঝরনা ধারার মত শীর্ণ জলের রেখা যায় দেখা। অনেক সময় মূল ধারাটা বোঝা যায় না। মানুষের আবিষ্কারের ব্যাপারেও ঠিক এমনি।

এর ইতিহাস লিখতে গেলে মানুষের ইতিহাসে ফিরে যেতে হবে। মানুষ অনেক আগে থেকেই আকাশের অনেক পিণ্ডের গতিবিধি জেনেছিল। চীনারা জেনেছিল। গ্রীকরাও। যেমন ধর, খৃষ্ট জন্মাবার ১৮০ বৎসর পূর্ব থেকে ১২৫ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গ্রীক হীপ্‌পারকাস এক হাজার আশিটা নক্ষত্রের হিসেব করেছিলেন। থাক্ এসব কথা। অত আগে না যাওয়াই ভালো।

উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ আকাশের গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে মেতে উঠেছিল। অনেক অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও হচ্ছিল তখন। মানুষ এই আকাশের রহস্য ভেদ করতে, তার দূরত্বকে জয় করতে, অধীর হয়ে উঠল যেন। অনেক ঠাণ্ডা-মাথা গাণিতিকও মেতে উঠলেন এই নেশায়। যেমন ধর, জগৎ বিখ্যাত গাণিতিক 'গাউস' (Gauss)। গাউস আর ভিয়েনার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী লিত্রভ (Littrov) অন্য গ্রহতে সংকেত পাঠাবার পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করলেন। এমন কি অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী চেষ্টা করতে লাগলেন, যদি কোনো না কোনো ভাষায়—সাংকেতিক ভাষায় অবশ্য—কোন গ্রহান্তরবাসী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় তাহলে তাদের সেই সাংকেতিক সংবাদ আমরা কী করে বুঝব তার উপায় ঠাহর করতে।

ঠাকুমা বলে উঠলেন, দেখছিস্ তো, মানুষ যা পারবে তা মানুষই অনেককাল আগে থেকে বুঝতে পারে, অনেককাল আগে থেকেই তা নিয়ে ভাবতে শুরু করে। সুমিত্রা যেমন এখন থেকেই পুতুলের সংসার চালায়!

সুমিত্রা লজ্জিত হয়ে বলে, কি যে বল ঠাকুমা! কাকামণি কি বলছে তা না বুঝে তুমি গোলমাল করছ!

ঠাকুমা হেসে বলেন, না রে, আমি ঠিকই বুঝছি!

অমর এসব আলোচনাকে পাশে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, আরো একটু এই ধরনের ইতিহাস বল না, কাকামণি! বেশ লাগছে।

—১৮২২ সালের জুলাই মাসের কথা। জার্মানীর মিউনিক শহরে এক পাগ্‌লা জ্যোতির্বিদ ছিল। নামটাও অদ্ভুত। Franz von Paula Gruithuisen ফ্র্যান্‌ৎস্ ফন পাউলা গ্রুইৎ-হুইজেন। তিনি ঘোষণা করলেন ঃ চাঁদে তিনি একটা 'প্রাচীর ঘেরা শহর' দেখতে পেয়েছেন। গ্রুইৎ-হুইজেন নিশ্চিত বিশ্বাস করতেন চাঁদে প্রাণী আছে। এ-যুগটাকে মহাকাশস্বপ্নের যুগ বলা যায়। মানুষ এ-যুগে খুব বিরাট বিরাট স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু কী আছে মহাকাশের মধ্যে তা জানার একমাত্র উপায় তাকে ছুঁয়ে দেখায়, তার মধ্যে যে গ্রহ-উপগ্রহেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের স্পর্শ করে।

সুমিত্রা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, স্পর্শ? স্পর্শ করবে কি করে?

—হাত বাড়িয়ে কি হয়? রকেট ছুঁড়ে।

—রকেট মানে তো 'হাউই', না কাকামণি?

—হ্যাঁ। আজকের রকেট হাউইয়েরই রূপান্তর। চেহারা বদলেছে, জ্বালানি বদলেছে। ছোঁড়ার কায়দাটাও বদলেছে।

—বল না! অধীর হয়ে ওঠে অমর।

—সব বলব। একটু ধৈর্য ধর্! এই রকেটের ইতিহাসও সুদূরপ্রসারী। অনেক দিন আগে থেকে শুরু। মহাকাশযানের পরিকল্পনার ইতিহাসে রুশ শিক্ষক জিয়লকভ্‌স্কির (Ziolkovsky) নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯০৩ সালে তাঁর লেখা 'রাকেতা ভ কস্‌মিচেস্কোয়ে প্রস্ত্রান্‌স্ত্‌ভো' (মহাকাশ রকেট) ছাপা হয়। আমি আর একজনেরও নাম করব। ইনিও রকেটের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেন। এই আলোচনার জন্যে তিনি বই লেখেন একখানা। বইটা জার্মান ভাষায় লেখা। নাম Rakete zuden Plantenraumen 'রাকেটে ৎসুডেন প্লানেটেনরয়মেন' অর্থাৎ 'উপগ্রহ আকাশে রকেট প্রেরণ।' তিনি বললেন, বিজ্ঞানের তখনকার অবস্থায়···

ওঠে। ২৪ হাজারের উপর বাড়ি ভেঙ্গেছে, ৫২ হাজার লোককে গৃহহীন করেছে, প্রায় ৬ হাজার লোক হত্যা করেছে।

ঠাকুমা বিস্মিত হয়ে বলে ওঠেন, এই সর্বনাশ থেকে মানুষের কী উপকারটা হয়ে গেল ভাবতো! তাইতো শাস্ত্রে বলেছে, অমঙ্গল থেকে মঙ্গলের উদ্ভব!

—হয়তো তাই মা! শোনা গেছে দু'তিনজন বৈজ্ঞানিক এই ভি-১, ভি-২ তৈরি করার সময় ভবিষ্যতের মহাকাশ ভ্রমণের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। এইজন্যে তাঁদের প্রাণও গিয়েছিল— নাৎসীদের হাতে।

—কি নাম তাঁদের?

—ডাঃ ফন ব্রাউন (Dr. Von Braun), ক্লাউজ রীডেল Klaus Riedel), হেলমুঠ কাইটেল (Hellmuth Keitel)।

—ছিঃ! ছিঃ! মানুষ কি নিষ্ঠুর!

—যুদ্ধের পর এই ভি-২ রকেট হয়ে উঠল আকাশের ঊর্ধ্বলোকের গবেষণার অস্ত্র। মারণাস্ত্র হয়ে উঠল মানুষের জয়যাত্রার অস্ত্র!

—প্রথম কবে মানুষ এই মহাশূন্যে তার স্পর্শের তিলক আঁকলে?

—মেক্সিকো (Mexico) মরুভূমিতে সাদা বালির (white sands) পরীক্ষা ক্ষেত্র থেকে ১৯৪৯ এর ২৪ এ ফেব্রুয়ারী দুপুর আর বিকেলের মধ্যে। এই রকেট ছিল রূপান্তরিত ভি-২। দু'শ পঞ্চাশ মাইল উঠল। যারা চেয়ে দেখলে তাদের বুকের মধ্যে সে কী আনন্দের উচ্ছ্বাস! মানুষ অনন্তকে যেন হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিলে!

—তারপর, কাকামণি? অমর উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

—তারপর চলে এসো ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবরে। মানুষ চাঁদ তৈরি করলে। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন তৈরি করলে নতুন চাঁদ। সারা বিশ্ব উৎকর্ণ হয়ে শুনলে শব্দ, 'বিপ! বিপ!

অমর জিজ্ঞাসা করে, কখনকার ?

—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। ১৯২৩ সালে। বললেন, বিজ্ঞানের তখনকার অবস্থায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে রকেট পাঠানো যায় ; আরও বললেন, সেই রকেটে মানুষও পাঠানো যায়।

—অবাক্ কাণ্ড! বলে উঠল অমর।

—অবাক্ হবার কিছু নেই। তিনি আগেই বুঝেছিলেন।

—কি নাম তাঁর ?

—তাঁর নাম, এইচ, ওবের্ট (H. Oberth)। ওবের্টের এই বইখানা মহাকাশ বিজ্ঞানে খুব মূল্যবান। এই ওবের্ট সাহেব ঘুরতে ঘুরতে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে জার্মানীর একটা গুপ্ত জায়গায় পৌঁছলেন। সেখানে তাঁর স্থান হয় নি। এই গুপ্ত জায়গা থেকে বিখ্যাত ভি-১ (V-1), ভি-২ (V-2), তৈরি হয়েছিল।

—জায়গাটার নাম কি ছিল কাকামণি ? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—নাম Peene munde (পীনে মুণ্ডে), মানে পীনের মুখ।

—কি রকম জায়গা ?

—বাল্টিক সমুদ্রের ধারে। শক্ত ঘাসওলা বালির পাহাড়। প্রাকৃতিক জঙ্গল, লম্বা লম্বা পাইন গাছ, ওপরে নীল আকাশ!

—বাঃ, কী সুন্দর জায়গা! বলে ওঠে সুমিত্রা।

—এই সুন্দর জায়গাতেই তৈরি হয়েছিল ভি-১, ভি-২!

—ভি-১, ভি-২, এ-দুটো কথার 'ভি' এর মানে কি ? প্রশ্ন করে অমর।

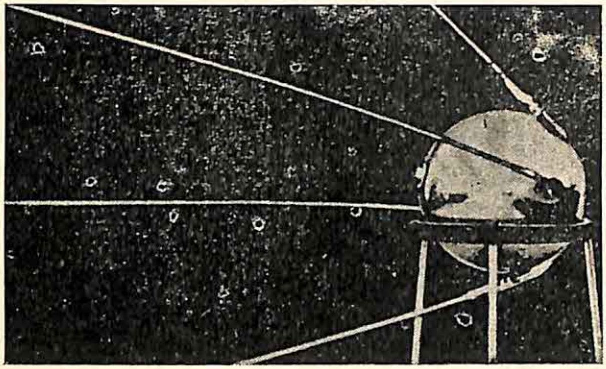
—ভি (V) অক্ষরটা জার্মান Vergeltung, 'ফেরগেলটুং' কথার আদ্যক্ষর।

—মানে কি কথাটার ?

—মানেটা সাংঘাতিক—মানে 'প্রতিহিংসা'। এই ভি-১, ভি-২ কী ভয়ানক সর্বনাশ করেছে তার হিসেব কষলে গা শিউরে

বিপ্ !' স্পুৎনিক থেকে সংকেত ! 'বিপ্ ! বিপ্ ! বিপ্ !' 'আমি ঠিক আছি, ভাবনা নেই !' 'বিপ্ ! বিপ্ !' মানুষের অভিধানে দুটো নতুন কথা যোগ হয়ে গেল। 'স্পুৎনিক' আর 'বিপ'।

—'স্পুৎনিক' মানে কি, কাকামণি ?



প্রথম স্পুৎনিক

—এটা রুশ কথা। মানে 'সহযাত্রী'। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে তার যাত্রা চলে আকাশপথে। তাই তার নাম 'স্পুৎনিক'। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর আমাদের যাত্রা শুরু। মহাকাশের অনন্ত শূন্যে যাত্রা শুরু ! নতুন যুগের যাত্রা শুরু ! নতুন মানুষের যাত্রা শুরু !

—নতুন মানুষ ? সুমিত্রা অবাক হয়ে যায়।

—মানুষ নতুন হয় কি কখনো ? সেই চিরকালের মানুষ মানুষই থেকে যাবে, বলেন ঠাকুমা।

—চাঁদে দাঁড়িয়ে মানুষ যখন পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখবে—একদিক দিনে ঝলমল্ অপরদিক আঁধারে মোড়া—তখন তার মনের প্রসার কী হবে তা ভাবতেই পারি নে !

অমর বলে, এবার, কাকামণি, এই স্পুৎনিক সম্বন্ধে সব কিছু বলো। কী তাদের গঠন, কেমন করে চলে ?

—এমনি এক রকেটে চড়ে যে মানুষ অন্যগ্রহে যাবে, আকাশ পাড়ি দেওয়ার সময় তার কেমন মনে হবে ? প্রশ্ন করে সুমিত্রা।

—বল্‌তো, পৃথিবীর বায়ু পেরিয়ে কি আছে ? প্রশ্ন করতে ঠাকুমাও বাদ যান না।

—ওখানে রঙ আছে কি ? গান ?..না থাকে তো, কি আছে ? আর, প্রাণী আছে কি কোথাও ? সুমিত্রার অনেক প্রশ্ন।

—জ্বালানী কি ? কেমন করে ছোঁড়া হয় ? কত জোরে চলে ? অনেক প্রশ্ন অমরেরও।

—ভেতর কেমন, বাইরে কেমন ? ঠাকুমারও প্রশ্ন আছে।

—খাবার সময় হয়েছে ! খেতে চল ! খেয়ে এসে বলব। বরেন উঠে পড়ে।

—সারারাত ধরে বলবে, কিন্তু ! সুমিত্রার আবদার।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সারারাত ধরে ! মানুষের নতুন জয়যাত্রার কথা সারারাত ধরে জেগে বলার মতোই কাহিনী !

॥ দুই ॥

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার আসর বসল।

ঠাকুমা বললেন, আমার মনে হচ্ছে নতুন যুগে নতুন কথকতার আসরে আমরা এসে বসেছি।

বরেন বললে, হ্যাঁ, মা, এমনি কথকতার আসর আজ আমাদের দরকার—গ্রামে গ্রামে। তা না হলে নতুন সভ্যতার সঙ্গে আমাদের দেশের নাড়ীর যোগাযোগ ঘটবে না। আমরা আজকের মানুষের মহাযজ্ঞের বাইরে পড়ে থাকব।

ঠাকুমা হেসে বললেন, অমর আজ ভাল করে খেলে না। ওর যেন সব চেয়ে বেশী তাড়া পড়ে গেছে এই যজ্ঞের প্রসাদ পাবার জন্যে।

অমর গম্ভীর হয়ে বললে, ঠাট্টার সময় নেই ঠাকুমা।

বরেন হেসে বললে, ঠিক! যেন আকাশে উঠেছি! মহাকাশে দাঁড়াবার আইন নেই। গতি কমানোও বিপজ্জনক।

অমর বললে, আমি ঐ কথাটাই জিগ্যেস করছি। স্পুৎনিকের মতো ভারী জিনিস শূন্যের মধ্যে সমান ভাবে একই পথ ধরে ঘুরছে কেমন করে? পড়ছে না কেন?

সুমিত্রা বিজ্ঞের মতো বললে, খু-ব জোরে ছোঁড়া হয়েছে! তাই না কাকামণি?

বরেন বললে, প্রকারান্তরে তাই।

ঠাকুমা বললেন, যতই জোরে ছোঁড়ো না কেন, পৃথিবীর জিনিস পৃথিবীতে পড়বেই!

অমর বললে, 'অভিকর্ষ' তো আছে!

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, অভিকর্ষ কি রে?

বরেন বললে, পৃথিবীর আকর্ষণ।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, জোর কতো কাকামণি?

বরেন বললে, জোর নির্ভর করে তিনটে মাপের ওপর। প্রথম, পৃথিবীর বস্তুর মাপ। দ্বিতীয়, অপর বস্তুর মাপ। তৃতীয়, এই দুটোর মধ্যে যে দূরত্বটা।

ঠাকুমা বললেন, দুটোর মধ্যে বস্তু বেশী থাকলে জোর বাড়বে?

বরেন বললে, নিশ্চয়ই।

সুমিত্রা প্রশ্ন করলে, দুটোর মধ্যে দূরত্ব বাড়লে কী হবে?

ঠাকুমা বললেন, নিশ্চয়ই কমবে। কি বলিস, বরেন? দূরে চলে গেলে টান নিশ্চয়ই কমবে। চোখের আড়াল হলে মানুষে মানুষে টান কমে, আর দূরত্ব বেড়ে গেলে বস্তুতে বস্তুতে টান কমবে না? ঈশ্বরের জগতে নিয়ম একই? কি? তাই না রে?

বরেন হেসে বললে, ঠিকই বলেছ, মা, দূরত্ব যত বাড়ে টান তত কমে।

ঠাকুমা বললেন, দেখলি, অমর, আমি ঠিকই বলেছি!

অমর বললে, বলছ ঠিক ঠাকুমা, কিন্তু তুমি কি অঙ্ক কষে বলতে পারো এই টানের জোর কতটা ?

ঠাকুমা হেসে বললেন, সেটা তোদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। ওসব মাপজোখ করবি তোরা।

—আচ্ছা, কাকামণি, তাহলে নিশ্চয়ই এমন একটা দূরত্ব আছে পৃথিবী থেকে যার বাইরে গেলে পৃথিবীর টান থাকবে না। টান প্রায় শূন্য হয়ে আসবে, বললে অমর।

— আছে বইকি।

—কতদূর পৃথিবী থেকে ?

—প্রায় ৯ লক্ষ কিলোমিটার। অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ লক্ষ মাইল। পৃথিবী থেকে চাঁদের সব চেয়ে বেশী যে দূরত্ব তার প্রায় আড়াই গুণ।

—পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব বুঝি কমে বাড়ে ?

—তবে যে, ভূগোলে পড়েছি, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব প্রায় দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইল।

—ওটা একটা গড় দূরত্ব। যে পথে চাঁদ ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে, যে পথগুলো ধরে গ্রহেরা ঘোরে সূর্যের চারধারে, সে পথগুলো চাকার মতো গোল নয়।

—অর্থাৎ বৃত্ত নয়। তবে কি ?

—মধ্যিখানে চাপা, চ্যাপটা বৃত্ত। একটা গোল ষ্টীলের চাকাকে জোরে চাপ দিলে যেমন চ্যাপটা হয়ে যায় তেমনি। ইংরেজীতে বলে 'ইলিপ্‌স্‌'।

ঠাকুমা হেসে বললেন, আমার ও ইংরেজী নামে কাজ নেই; অনেকটা জিবেগজার মতো, কি বলিস্ বরেন ?

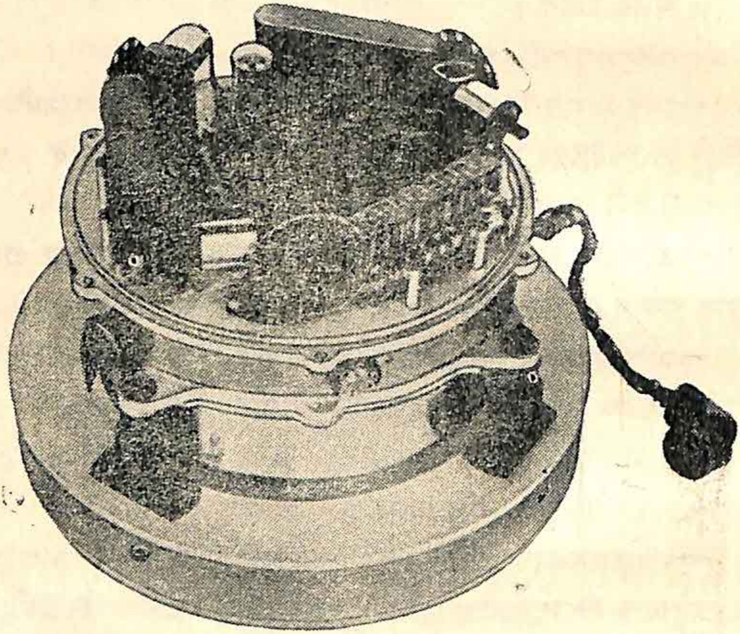
—কী করছ ঠাকুমা, অমরের কাছে জিবেগজার নাম করছ ? ও আর গল্প শুনবে না। আগে জিবেগজা খেতে চাইবে। বলে হেসে উঠল সুমিত্রা।

অমর বিরক্ত হয়ে উঠল।—যা, যা, আমি আর অত ছেলেমানুষ নেই। তুমি বলে যাও কাকামণি, ঠাকুমার বাজে কথায় কান দিও না।

সুমিত্রা বলে উঠলে, আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরটার ব্যাখ্যা চাই।

—তোর আবার কী প্রশ্ন ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—ঢিলটা কত জোরে ছুঁড়লে ওটা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে ?



স্পুৎনিকে স্থাপিত সূর্য-নির্গত রশ্মি পরিমাপের যন্ত্র

—ঘুরবে না হাতি! হাওয়ার মধ্যে যেতে গিয়ে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, আমি যদি পৃথিবীর ওপরে যেখানে হাওয়া শেষ হয়ে গেছে সেখান থেকে ছুঁড়ি, তাহলে কত দূর যাবে ?

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, হাওয়ার ভেতর দিয়ে জোরে ছুঁড়লে পুড়ে যায় কেন রে ?

—প্রথম কারণ, হাওয়াটা একটা বস্তু।

—গ্যাস। বিজ্ঞের মতো বলে অমর।

—হ্যাঁ, গ্যাস। গ্যাস তো বস্তুর একটা অবস্থা। একটা বস্তুর ভেতর দিয়ে আর একটা বস্তু যেতে গেলে সে বাধা পাবেই। যেমন কাঠের মধ্যে পেরেক পুঁতলে পেরেকটা গরম হয়ে যায়।

ঠাকুমা বলেন, রেগে গরম হয়ে যায়, কি বলিস ?

—তোমার ভাষায় বলতে পার। আমরা বলি এই বাধাটা তাপের চেহারা নেয়। হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ঢিল ছুটে গেলে হাওয়া যে-বাধা দেয় তাতে ঢিলটা গরম হয়ে ওঠে। ঢিলটা খুব জোরে ছুটে গেলে অতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হয়। সেই তাপে ঢিলটা পুড়ে যায়।

—মনে কর কাকামণি, আমি এমন জায়গা থেকে ছুঁড়লাম যেখানে হাওয়া নেই। প্রশ্ন করে সুমিত্রা।

ঠাকুমা অবাক হয়ে বলেন, এমন জায়গা আছে নাকি ?

—হ্যাঁ, মা, হাওয়া আর কতদূর আছে ? এই একটুখানি উঁচুতে গেলে আর হাওয়া নেই।

—একটুখানি ? বিশ্বাস হয় না ঠাকুমার।

—বিজ্ঞানীদের হিসেবে একটুখানি ধরো, আন্দাজ, তিনশ' মাইল। তিরিশ মাইলের ওপরে উঠলেই হাওয়ার বাধা খুব কমে যায়।

সুমিত্রা এবার জোর পেয়ে গেল। বললে, যেখানে হাওয়া নেই সেখান থেকে কত জোরে ঢিল ছুঁড়লে তবে তা পৃথিবীর চারদিকে দ্বিতীয় স্পুৎনিকের মতো নকল চাঁদ হয়ে ঘুরবে ?

—তোর কেবল ঢিল আর ঢিল ? কেন, গোলা বলতে পারলি নে ? টিপ্পনি কাটে অমর।

—ও মেয়ে কিনা, তাই ঢিলের মতো নিরীহ জিনিস বলছে।

তোদের মতো সব সময় তো ওর লড়াইয়ের চিন্তা নেই। পালটা টিপ্পনি কাটেন ঠাকুমা হেসে।

বরেন বলে, কিন্তু, মা, স্যার আইজাক নিউটন পৃথিবীর আকর্ষণ সম্বন্ধে যে-বই লিখেছিলেন তাতে তিনি এমনি একটা গোলার উদাহরণই দিয়েছিলেন। উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, গতি দিয়ে পৃথিবীর আকর্ষণকে এড়ানো সম্ভব।

—নিউটনের উদাহরণটা বল না কাকামণি। অমর ধরে বসে।

—মনে কর, এমন একটা পাহাড় আছে যার মাথা বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে উঠে গেছে।

—বায়ুমণ্ডল আবার কী রে? ঠাকুমা বুঝতে পারেন না।

—পৃথিবীর গায়ে হাওয়ার যে-বালাপোশটা জড়ানো রয়েছে সেটাই বায়ুমণ্ডল।

সুমিত্রা হেসে বলে, পৃথিবীর আশে-পাশে বুঝি খুব শীত, কাকামণি?

—পরে বলব। বরেন হেসে ওঠে।

বরেন বলে চলে, মনে কর সেই পাহাড়ের মাথায় একটা কামান বসানো হয়েছে—তার নলটাকে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে। ধরে নিচ্ছি নীচের মাটিটা একেবারে সমতল।

—কিন্তু তাতো নয়। পৃথিবীর গা-টা তো ঢালু—গোল বলের গায়ের মতো।

—ঠিকই। আমি বোঝাতে চাইছি ইংরেজীতে যাকে 'হোরাইজন্টাল' দিক বলে সেই দিকটাকে।

ঠাকুমা বলেন, ওসব ইংরেজী কথা বাদ দে বরেন। তোরা ইংরেজী ছাড়া কিছু বোঝাতে পারিস নে ব'লে আমি বুঝতে পারি নে। আসলে তো তোদের চেয়ে আমাদের বুদ্ধি কম নয়।

—বুদ্ধি কেন কম হবে, মা? আমরা বোঝাতে পারি নে সেটা আমাদের অক্ষমতা।

সুমিত্রা বলে, অর্থাৎ, কামানের নলটাকে সোজা করে পাতা হলো।

—কী করে বুঝব কোন্‌টা সোজা দিক্? চ্যালেঞ্জ করে অমর।

বরেন বলে, আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বন্দুকের নলের মধ্যেখান পর্যন্ত একটা রেখা দিয়ে যোগ করা হলো। তারপর নলটাকে সেই রেখার সঙ্গে নব্বুই ডিগ্রী কোণ ক'রে বসানো হল।

ঠাকুমা বললেন, তুই যে জটিল করে তুললি? তার চেয়ে আগের ব্যাখ্যাটাই ভাল। ধরে নিলাম সোজা করে বসানো হলো। মনে ক'রে নিলুম, সোজা। ধর, রাজমিস্ত্রীরা যে-যন্ত্রটা বসিয়ে মেঝে সমান হোল কিনা দেখে নেয় সেই রকম একটা যন্ত্র বসিয়ে।

—ঠিক্! ঠাকুমা ঠিক ধরেছেন, দেখ লে কাকামণি! খুশী হলো সুমিত্রা।

—ঠিক্!···তারপর কামান থেকে গোলা ছোঁড়া হলো। গোলাটা কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়বে। যে পথ ধ'রে তা মাটিতে নামবে সেটা কাগজে এঁকে ফেললে দেখবে সেই পথটা বাঁকা। কামানের মুখ থেকে শুরু করে প্রত্যেক বিন্দুতে বাঁকতে বাঁকতে মাটিতে নেমেছে।

—ওপরে জলের ট্যাঙ্ক ফুটো হ'লে জল যেমন বেঁকে মাটিতে পড়ে তেমনি, না কাকামণি? সুমিত্রা বুঝে নেয়।

—হ্যাঁ, ওই একই ধরনের পথ। কামানের জোর বাড়িয়ে দিয়ে গোলাটাকে যদি আরও জোরে ছোঁড়া হতো, তাহলে সেটা আরও দূরে, অমনিই বাঁকা পথে মাটিতে পড়তো। মনে কর, এমনি করে আমরা গোলার বেগ ক্রমাগত বাড়িয়েই যাচ্ছি। এক সময় দেখা যাবে সেটা আর মাটিতে পড়ল না—যেখান থেকে সেটা ছোঁড়া হয়েছিল সেখানেই ঘুরে এল।

অমর বুঝতে পারে না।—এমন কী করে হবে? যেখানে হোক এক জায়গায় পড়বে তো?

—ব্যাপার আছে। গোলাটা পৃথিবীর টানে নামছে ঠিকই; কিন্তু পৃথিবীর তলটা বাঁকা তো, তাই গোলাটা যতটা পথ নামছে মাটিটা ততটা যেন নীচে সরে যাচ্ছে।

—পায়ের তলায় মাটিটা বুঝি নীচে সরে সরে যাচ্ছে! ঠাকুমা বললেন।

—তা বলতে পারো। এর ফলে হচ্ছে কি গোলাটা মাটিতে পৌঁছতে পারছে না। মাটির থেকে সমান দূরত্বে ঘুরছে।

—কত জোরে ছোঁড়া হলে এমন ধারা হবে? প্রশ্ন করে অমর।

—হিসেব করে দেখা গেছে সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল গতি পেলেই গোলাটা গোল পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে।

ঠাকুমা তুলনা করে বললেন, গোল মন্দির পরিক্রমার মতো।

—কিন্তু ঠাকুমা, শেষে প্রণাম করার জন্য মাথাতো আর ঠেকাতে পারছে না! অমর হেসে বলে।

—আচ্ছা, তার চেয়েও জোরে যদি ছোঁড়া যায় তাহলে কী হবে? সুমিত্রার কৌতূহল যায় বেড়ে।

—তাহলে গোলার গতিপথের বাঁকটা পৃথিবীর ওপরকার বাঁকের চেয়ে কম হবে।

—বুঝলাম না।

—তার মানে গোলার গতিপথ পৃথিবীর গোলের প্রতিবিম্ব হবে না। গতিপথটা পৃথিবীর দিক ছাড়িয়ে ওপরে মুখ করে সূর্যের দিকে বেঁকে যাবে। গতির মাপ বেশী হলে গোলাটা ছিটকে পৃথিবী থেকে দূরে চলে যাবে। সূর্যের চারদিকে বিরাট একটা চ্যাপটা গোলপথে ঘুরতে থাকবে।

—সেকেণ্ডে কত মাইল গতি হলে এরকম হবে, কাকামণি? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—সেকেণ্ডে সওয়া আট মাইলের (৮·২৫) কাছাকাছি।

—তারচেয়ে বেশী গতি হলে ?

—সূর্যের আকর্ষণ ছাঁড়িয়ে অনন্তে ধাওয়া করবে।

—তার মানে, সেকেণ্ডে ৫ মাইল বেগ হলে—

—পথটা হবে গোল—আর তা হবে পৃথিবীর চারদিকে—

—আর সেকেণ্ডে সওয়া আটের কাছাকাছি হলে ?

—পথ হবে গোল অথচ চ্যাপটা……আর তা হবে সূর্যের চারদিকে, অর্থাৎ গোলাটা গ্রহ হয়ে যাবে।

—আর, তার চাইতে বেশী হলে ?

—একেবারে অনন্ত শূন্যে।

—কিন্তু, যেখান থেকেই ছোঁড়া হোক্ না কেন এই দুটো গতিবেগের ওপরই কি গোলাটার চাঁদ হওয়া বা গ্রহ হওয়া নির্ভর করে ? অর্থাৎ এই দুটো গতি কি বাঁধা ? সব ক্ষেত্রেই, সব উচ্চতায় ?

—না, তা কেন হবে ? সেকেণ্ডে ৫ মাইল গতি হলো সমুদ্র-পৃষ্ঠের হিসেব। অর্থাৎ সমুদ্রের পিঠ থেকে যদি গোলাটা ছোঁড়া যায়, তাহলে এই বেগই যথেষ্ট হবে তাকে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরাবার জন্যে।

—সমুদ্রের পিঠে তো হাওয়া আছে।

—ধরে নাও হাওয়া নেই।

—মাটিতে ঘষে যাবে না ?

—এটা একটা কাল্পনিক হিসেব। গতিবেগের মাপটা বোঝানোর জন্যে এই অঙ্কটা উল্লেখ করা হয়েছে। যত ওপরে উঠবে এরচেয়ে তত কম গতিবেগ দিলেও গোলকক্ষে ঘুরবে। এই গতিবেগের পরিমাপটা নির্ভর করে ছোঁড়ার জায়গায় অভিকর্ষের পরিমাপের ওপর।

—তবে চাঁদের গতিবেগ কি সেকেণ্ডে ৫ মাইল ?

—না, এক সেকেণ্ডে এক মাইলের তিনভাগের দু'ভাগ। তার মানে চাঁদ যতদূরে, ততদূর দিয়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরাতে গেলে গোলাটাকে ঐ গতিবেগ দিতে হবে। চার হাজার মাইল ওপরে দরকার হবে সেকেণ্ডে দুই দশমিক নয় শূন্য মাইল বেগের।

—দুই দশমিক নয় শূন্য ? সে আবার কী রে ? ঠাকুমা বুঝতে পারেন না।

অমর বললে, দু-মাইল আর এক মাইলের একশ ভাগের নব্বুইভাগ!

ঠাকুমা হেসে বললেন, দেখলি তো, আমি তোর চেয়েও কম জানি।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা কাকামণি, সেকেণ্ডে ৫ মাইল বেগ হলে পৃথিবীর চারদিক ঘুরতে কত সময় লাগবে ?

—যদি হাওয়া না থাকতো, তাহলে সময় লাগতো ৮·৪ মিনিট।

—আচ্ছা, চার হাজার মাইল ওপর থেকে ছুঁড়লে এই সময় কত হতো ?

—চার ঘণ্টা।

—আচ্ছা, কাকামণি, এই সব হিসেব কী করে করা হয় ? আসল গ্রহ-উপগ্রহের বেলায় যা হিসেব, নকলের বেলায়ও কি তাই ?

—হ্যাঁ, দু-দলের ক্ষেত্রেই একই নিয়মে হিসেব করা হয়।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, এ-হিসেবটা প্রথম কে বের করেছেন ?

—জোহানেস কেপলার।

—কতদিন আগে ?

—১৬০৯ সালে তিনি 'মঙ্গলের গতি' নিয়ে বই লেখেন। এর মধ্যেই তাঁর তিনটে নিয়মের উল্লেখ ও বিবরণ পাওয়া যায়।

—নিয়ম তিনটে কি, কাকামণি ?

—লোকটি কেমন ছিলেন ? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—লোকটি শারীরিক দিক থেকে সুখী ছিলেন না। প্রায়ই অসুখে ভুগতেন। কিন্তু অসুস্থ হলে কী হয়? মনের জৌলুস ছিল খুব। 'ঘুম' নামে একখানা মজার বইয়ে তিনি প্রথম চন্দ্রযাত্রার বিবরণ লিখেছিলেন।

—নিয়ম তিনটে কি কাকামণি?

—বলছি, বলবার আগে আর একটা বিষয় বলা দরকার। গ্রহকে ঘিরে ঘোরে উপগ্রহ, আর সূর্যকে ঘিরে গ্রহ। ঘোরার এই পথ কেপলার দেখলেন, গোল নয়, মাঝে চ্যাপটা। ডিমকে লম্বাদিকে দুফালা করে কাটলে তার কাট বরাবর যে রেখাটা তৈরী হয় প্রায় তেমনি। মনে কর এই গতিপথের বেড় দিয়ে একটা ক্ষেত্র তৈরী হোলো। এই ক্ষেত্রটি কখনোই পুরো গোল নয়—চাকার মতো। ক্ষেত্রটি গোল হলে তার একটা কেন্দ্র থাকতো। এই ক্ষেত্রটার কিন্তু একটা মধ্য বিন্দুর বদলে দুদিকে দুটো 'নাভির' কল্পনা করা হয়েছে। গ্রহের বেলায় এই ক্ষেত্রটার একটা নাভিতে সূর্য থাকে। উপগ্রহর বেলায় থাকে পৃথিবী বা অন্য কোনো গ্রহ। গতিপথটা বৃত্ত হলে গ্রহ বা উপগ্রহ সূর্য বা গ্রহ থেকে সব সময় সমান দূরেই থাকতো। কিন্তু বৃত্ত নয় ব'লে গ্রহ উপগ্রহের দূরত্ব সূর্য বা গ্রহ থেকে বাড়ে কমে। গতিপথের এক জায়গায় গ্রহ থেকে উপগ্রহের দূরত্ব সব চেয়ে কম আর এক জায়গায় সব চেয়ে বেশী। অন্য সব জায়গায় তার দূরত্বটা এই সবচেয়ে কম আর সবচেয়ে বেশী দূরত্বের মাঝামাঝি।

—এবার কেপ্‌লারের নিয়ম তিনটে কি বল না, কাকামণি?

—প্রথম নিয়ম, জ্যামিতির হিসেব। উপগ্রহ নিয়ে বিচার করা যাক্। উপগ্রহের গতিপথের ওপর যে বিন্দু গ্রহ থেকে সব চেয়ে কাছে তার নাম দেওয়া যায় যদি 'নিকট বিন্দু' আর যে বিন্দু গ্রহ থেকে সবচেয়ে দূরে তার নাম দেওয়া যায় যদি 'দূর বিন্দু' তাহলে কেপ্‌লারের প্রথম নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর বা

গ্রহের মধ্যবিন্দু থেকে 'নিকট বিন্দুর' দূরত্ব আর 'দূর বিন্দু' থেকে অন্য নাভির দূরত্ব, এই দুটো দূরত্ব হবে সমান।

—আমার কিন্তু মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে এই সব মাপজোখে। বলে সুমিত্রা।

—থাম তুই। জানতে হবে না? আচ্ছা কাকামণি, এবার দ্বিতীয় নিয়মটা বলো না! সুমিত্রাকে দমিয়ে দেয় অমর।

বরেন বলে, দ্বিতীয় তৃতীয় নিয়ম দুটো একটু জটিল!

—থাক আর জেনে কাজ নেই। বলে সুমিত্রা।

—চুপ! না জানলে বুঝব কেমন করে? জানবার জিনিস জানব না? অমর ছাড়বে না।

ঠাকুমা বলেন, কিন্তু ভাই, বুঝতে পারছিনে যে। আচ্ছা, তুই বল বরেন। দেখি চেষ্টা করে বুঝতে পারি কিনা!

—ইলাস্টিক সুতো দেখেছো তো!

সুমিত্রা ও অমর একত্রে বললে, হ্যাঁ দেখেছি!

—মনে করো ইলাস্টিক সুতোটা রঙে চোবানো।

—আচ্ছা মনে করলাম। বলে অমর।

—এবার মনে করো এমনি একটা সুতো দিয়ে গ্রহের সঙ্গে উপগ্রহটা বাঁধা।

অবাক হয়ে অমর বললে, আচ্ছা মনে করলাম। তারপর?

—এবার মনে কর আকাশে যে কাল্পনিক ক্ষেত্রটার ওপর উপগ্রহের গতিপথটা রয়েছে সেটা বিরাট একখানা সাদা কাগজ!

—আচ্ছা তাও মনে করলুম!

—উপগ্রহটা গ্রহের চারদিকে ঘুরবে যখন, তখন কাগজ খানার উপর সুতোটা গড়িয়ে যাবে, আর তাতে রঙ লাগবে।

—আচ্ছা তাই যেন হোলো।

—সমান সময়ে সমান জায়গায় রঙ পড়বে। এই হোলো কেপলারের দ্বিতীয় নিয়ম!

—এই নিয়মের কী ফল ?

—এই নিয়ম দিয়ে গতিপথের ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে উপগ্রহের গতির হিসেব করেন বিজ্ঞানীরা। এই নিয়ম আছে বলেই পৃথিবী থেকে দূরে গেলে উপগ্রহের গতি কমে আর তা পৃথিবীর কাছে এলে তার গতি বাড়ে।

—তৃতীয় নিয়মটা কি ?

—ওটা আরও শক্ত। এটায় দুটো মাপের পরস্পর সম্বন্ধ জানা যায়। একটা মাপ সময়ের মাপ। পৃথিবীকে একবার ঘুরে আসার সময়ের মাপ। দ্বিতীয়টা দূরত্বের মাপ। গতিপথ ঘেরা ক্ষেত্রটার সবচেয়ে লম্বাদিকের যা মাপ সেই মাপের অর্ধেক। চ্যাপটা দিকটার চওড়ার ওপর ঘুরে আসার সময়টা নির্ভর করে না। এটাই কেপলারের তৃতীয় নিয়ম।

ঠাকুমা বলেন, এবার বল্‌তো বরেন, একবার উপগ্রহ স্থষ্টি হ'লে কতকাল তা উপগ্রহ হয়ে থাকতে পারে ?

—চিরকাল থাকতেও বাধা নেই।

—চিরকাল থাকবেই, একথা বল্‌ছো না কেন ?

—উল্কাপিণ্ডদের সঙ্গে ধাক্কা লেগে, মহাকাশ ধুলির সংস্পর্শে এসে, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আরও অন্যান্য সব কারণ আছে যা উপগ্রহের আয়ু নষ্ট করে দেয়।

—মহাকাশে ধুলো ? তুই কি বলছিস্ রে ?

—পৃথিবীর ধুলো নয়—অন্য ধরনের ধুলো। পরে বলবো। তাছাড়া নকল উপগ্রহের গতিপথের কোনো অংশ যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে পড়ে তাহলে কালক্রমে বায়ুর বাধায় তার বেগ আসে কমে। আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে তার গতিপথের দূরত্ব কমে আসে। এই দূরত্ব যত কমে আসতে থাকে, উপগ্রহের গতিও তত কমে আসে। শেষে উল্কার মতো পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

—আচ্ছা কাকামণি, মাটিতে পড়বে ছাই হয়ে ? অমর জিজ্ঞাসা করে।

—না, সাধারণ উল্কারা মাটি থেকে ৭৫-৯০ কিলোমিটার ওপরেই পুড়ে যায়। উপগ্রহের দশাও তাই হতে পারে যদি ওর গতিপথের কোনো অংশ বায়ুমণ্ডলের মধ্যে পড়ে যায়।

ঠাকুমা আবার বললেন, হিসেবপত্র তো সব বুঝিয়ে দিলি। এবার বল্‌তো এই নকল উপগ্রহ সেকেণ্ডে ৫ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইল বেগে যায় কেমন করে ?

সুমিত্রা বলল, বিরাট কামান থেকে ছুঁড়লেই হয়—এক পাহাড় বারুদ ঠেসে নলের মধ্যে।

—হিসেব করে দেখা গেছে তা পারা যায় না। এমন কোন বারুদ নেই (আণবিক বারুদ ছাড়া) যা এ কাজে লাগানো যেতে পারে।

—তাহলে কী করে স্পুৎনিক উপগ্রহের বেগ পেল ?

—খুব ভাবনায় পড়ে গেছ, না ?

—হ্যাঁ, বল না, কাকামণি, কী করে সম্ভব হলো ?

—'জেটবিমান' কথাটায় 'জেট' জিনিসটা কি জান ?

—না। অমর জানে না।

—আমি জানি, সুমিত্রা বলে, দোলের সময় পিচকারি থেকে বেরোনো রঙের ফিনকি।

—ছবি আঁকো কিনা তাই রঙ ছাড়া তোমার মাথায় কিছু আসে না।

—বলো, কাকামণি, সময় বয়ে যাচ্ছে। অমর তাগিদ দেয়।

॥ তিন ॥

বরেন বললে, অনেকক্ষণ অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামানো হয়েছে, এবার একটা গল্প বলা যাক।

—কিসের গল্প? সুমিত্রা কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

—খুনের গল্প।

—খুনের গল্পের সঙ্গে আমাদের আলোচনার কী সম্পর্ক আছে?

বরেন হেসে বললে, কিসের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলা খুব মুশকিল। শোনোই না।

—আচ্ছা বল।

—১৮৮১ সালের ১লা মার্চ। রাশিয়ার সেণ্টপিটার্সবুর্গ শহরের বিখ্যাত রাজপথ নেভাপ্রস্‌পেক্ট। নেভা নদীর তীরে বেড়ানোর রাজপথ। সেই পথ ধ'রে একটা প্রকাণ্ড জমকালো গাড়ি চলছিল। হঠাৎ কোথা থেকে একটা লোক এসে গাড়িটার সামনে দাঁড়াল। একটা দেহভঙ্গী করে কী একটা ছুঁড়লে গাড়ির দিকে। একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো। পুলিশের বাঁশী বেজে উঠল। আবার একটা বিস্ফোরণ, তারপর সব চুপ...। রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার আততায়ীর বোমায় প্রাণ হারালেন।

—তাতে বিজ্ঞানের কী উপকার হলো? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে অমর।

—এই বোমা তৈরী করেছিল নিকোলাই কিবালচিচ। সেণ্টপিটার্সবুর্গের চিকিৎসাবিদ্যার এক ছাত্র।

—কত বয়স ছিল ছাত্রটির? জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুমা।

—আন্দাজ সাতাশ।

—ধরা পড়ল?

—নিশ্চয়ই। জেলে গেল প্রথম।

—কেন এ কাজ করল ?

—আমাদের দেশে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মতো দুঃশাসক হত্যার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এ-কাজ করেছিল।

—জেলে খুব কষ্ট পেয়েছিল, না ?

—না, কোন কষ্টের বোধ তার ছিল বলে জানা যায় নি। জানা গেল, সে জেলখানায় বসে বসে একটা উড়ন্ত রকেটের ডিজাইন করে গেছে। এমন রকেট যাতে চেপে মানুষ একদিন তারার দেশে পাড়ি দিতে পারবে।

—অবাক কাণ্ড! যে খুন করলে সেই আবার ভাবলে তারার দেশে পাড়ি দেবার কথা ? সুমিত্রা অবাক হয়ে বলে।

ঠাকুমা বললেন, ওর আত্মাটা ঐ তারাদের দেশের জন্য আকুল হয়েই ছিল, তাই দেশের দুঃশাসন ওর সইতো না।

—হয়তো তাই! মানুষের জঘন্য পেষণ যন্ত্রকে ও বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়ে স্বর্গরাজ্য তৈরী করতে চেয়েছিল বোধ হয়। তা যাক্—এবার আসল কথায় আসা যাক্। সাতাশ বছরের সেই স্বপ্ন-দর্শী ছেলে কাগজে লিখে গেছে—

—কী এমন লিখে গেল, যাতে···, অমর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে।

—লিখে গেল, ঠিক অনুবাদ করতে পারছিনে—আসল লেখাটা সামনে নেই। তবে যা লিখেছিলেন তার মর্ম্ম অনুবাদ করে শোনাচ্ছি, শোনো,

'একটা ঢালাই লোহার ফাঁপা লম্বা পাত্র নাও। এর এক দিক বন্ধ। অন্যদিকে একটা ছিদ্র। এটার মধ্যে বারুদ পুরে ফাঁক দিয়ে জ্বেলে দিলে উৎপন্ন গ্যাস চাপ দেবে ভিতরের দেওয়াল-গুলোতে। দেওয়ালগুলোতে বিপরীত চাপ উৎপন্ন করে এই চাপকে ঠেকিয়ে রেখে দেবে। একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটবে খোলা মুখটায়। এখানে উৎপন্ন চাপকে প্রতিরুদ্ধ করার মতো কোনো কিছু বাধা

না থাকায় তা জোরে বেরিয়ে আসবে। এই চাপের জোরের বিপরীত পরিমাণ জোর পড়বে বিপরীত দিকের বন্ধ মুখের ভিতরের দেওয়ালে। এই বন্ধ মুখটাকে উঁচু করে যন্ত্রটাকে ছেড়ে দিলে এটা উপরে উঠে যাবে।' এটা আসলে নিউটনের তৃতীয় নিয়মের কার্যকরী ব্যবহার।

—নিয়মটা কী কাকামণি?

—নিয়মটা হোল এই যে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

একদিকে গ্যাস যখন প্রবল বেগে নির্গত হয় তখন তার বিপরীত দিকে সমান বলের উৎপত্তি হয় ও সমপরিমাণ চাপ কাজ করে।

ঠাকুমা বলেন, এটা যদি প্রকৃতির নিয়ম তাহলে প্রকৃতির মধ্যেও এই নিয়মের স্বাভাবিক প্রয়োগ থাকবে নিশ্চয়ই।

—আছে, মা। সমুদ্রের প্রাণী অক্টোপাসের নাম শুনেছো নিশ্চয়ই।

—আমি পড়েছি অক্টোপাসের কথা, বলে অমর।

—অক্টোপাস তার দাড়া দিয়ে সুমুখে এগিয়ে চলে, কিন্তু পিছিয়ে আসার সময় দাড়াগুলো ব্যবহার করে না। তখন করে কি, দেহ থেকে জলের জোর একটা ফিনকি ছেড়ে দেয় যার ফলে সে পিছিয়ে আসে।

এই সেদিন বছর ন'দশ আগে হেয়েরদাল সাহেব (Heyerdahl) তার 'কনটিকি' (Kon-Tiki) বইতে প্রশান্ত মহাসাগরের এক ধরনের শামুক জাতীয় প্রাণীর কথা জানিয়েছেন। এদের নাম 'আবালোন' (Abalone)। এরা জোরে ফিনকি ছেড়ে জল থেকে লাফিয়ে উঠে হাওয়ার মধ্যে ৪৫।৫০ গজ পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে।

ঠাকুমা বলেন, অদ্ভুত! প্রকৃতির মধ্যে যা নেই তা মানুষের মস্তিষ্কেও নেই!

—মানুষ যে প্রকৃতিরই অংশ মা। মানুষের মস্তিষ্কে গোটা প্রকৃতি যেন তার সমস্ত নিয়ম নিয়ে ঘুমিয়ে আছে—ধীরে ধীরে জাগছে। এটাই মানুষের অভিব্যক্তি।

—অভিব্যক্তি কি কাকামণি, জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা ?

—পর্যায়ে পর্যায়ে বৃদ্ধি। যেমন সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে গাছ—কিংবা বানর জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষ—যাক্ এটা অন্য প্রসঙ্গ।

রকেট চলে নীচের অংশ থেকে গ্যাস বের করে দিয়ে। জেট এরোপ্লেন দেখ নি ? আকাশ দিয়ে চলবার সময় ওদের পিছনে শীর্ণ মেঘের মতো একটা গ্যাসের স্তর পড়ে থাকে।

—কিবালচিচ বোমায় যা বারুদ দিয়েছিলেন মহাকাশ রকেটে কি তাই আছে, জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা ?

—তাই কখনো কি থাকতে পারে, পাগলী মেয়ে ? তারপর যে কত বছর বয়ে গেছে। ইন্‌জিনিয়ররা কত জ্বালানি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন তার ঠিক নেই। প্রথম প্রথম কঠিন জ্বালানি নিয়ে পরীক্ষা হয়। কিন্তু কঠিন জ্বালানিতে এত জোর হয় না। তাছাড়া বারুদ ধরনের কঠিন জ্বালানি এক মুহূর্তে ফেটে পড়ে, তাতে রকেটের দেহের ক্ষতি হয়।

—নানান সমস্যা আছে, না কাকামণি ? অমর গম্ভীরভাবে বলে।

—হ্যাঁ, নানান সমস্যা। তা ছাড়া আকাশে রকেট ছুঁড়লেই তো যথেষ্ট নয়। তার মধ্যে মানুষ পাঠাতে হবে তো ? মানুষ খুব দ্রুত গতি-পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না। গতি ধীরে ধীরে বাড়া চাই। একেবারে শূন্য বেগ থেকে ঘণ্টায় কয়েক হাজার মাইল বেগ যদি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তৈরী হয়ে যায়, তাহলে গতির এই সহসা পরিবর্তন মানুষ সহ্য করতে পারবে না। তাই বিজ্ঞানীরা কঠিন জ্বালানি ছেড়ে তরল জ্বালানি চালু করার চেষ্টা করলেন। তরল জ্বালানির সুবিধে এই যে তা শুধু কঠিন

জ্বালানির চেয়ে বেশী শক্তিশালী নয়, তাকে ধীরে সুস্থে একটু একটু করে খরচ করা যায়। তা ছাড়া আরও একটা সুবিধে যে, অঙ্ক কষে যে বেগ পাওয়া যাবে তার চেয়ে বেশী বেগ তৈরী করার ব্যবস্থা হাতে জমা রেখে দিতে পারা যায়—সময় মত সেটা কাজে লাগিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য।

—কেন জমা রেখে দিতে হয়, কাকামণি ?

—প্রথম কারণ যে কোনো রকেটই হোক্ না কেন, তাকে পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে যেতে হয়—যার ফলে ক্রমশ তার বেগ কমে আসতে থাকে। তা ছাড়া বায়ুর বাধা আছে। মনে কর ৭০০ মাইল গিয়ে বেগ গেল কমে, জ্বালানি গেল ফুরিয়ে। তখন কী হবে ?

ঠাকুমা বলেন, নিশ্চয়ই নীচে পড়ে যাবে।

—তাই, হাতে কিছু জমা রেখে দিতে হয়।

—তাহলে তো অনেকখানি জ্বালানি রেখে দিতে হয়। ট্রেনের ইঞ্জিন মাঝে মাঝে কয়লা নেয়। রকেট কোথায় জ্বালানি পাবে মাঝপথে ?

—তার ব্যবস্থা মানুষ করেছে। পরে বলবো। এখন ধরো, ট্রেনের ইঞ্জিনকে যদি সারাপথের জ্বালানিটা ব'য়ে নিয়ে যেতে হ'তো তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াতো।

—দিল্লী যেতে অর্ধেক গাড়িতে কয়লা পুরে নিয়ে যেতে হতো।

—দূরাকাশগামী রকেটকেও অনেকটা জ্বালানি বইতে হয়। জ্বালানি ছাড়া তার যা ওজন, তার অনেকগুণ জ্বালানি তাকে বইতে হয়।

—তরল জ্বালানি হলেও ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—হ্যাঁ, তরল জ্বালানি হলেও। রকেটের বেগ আসলে দুটো পরিমাপের ওপর নির্ভর করে। একটা হোলো গ্যাসের নির্গমন

বেগ। আর একটা হোলো যাকে বিজ্ঞানীরা বলেছেন Mass Ratio—ওজন অনুপাত।

—কীসের সঙ্গে কীসের অনুপাত?

—একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। ভি-২ রকেটের বেলায় যেমন রকেটের ওজন ছিল ৩ টন। তার মাথার অংশের ওজন ছিল ১ টন আর জ্বালানির ওজন ছিল ৮ টন।

—ওর মাথা আর দেহকে আলাদা করে বললে কেন, কাকামণি?

—আসল অংশ ঐ মাথা। ঐখানে থাকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। মানুষ গেলে ঐখানে বসবে; সঙ্গে থাকবে পথের সম্বল খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য দরকারী জিনিস। এর ইংরেজী নাম Pay load অর্থাৎ অত্যাবশ্যক ওজন। এটাই আসলে উপগ্রহ হয়ে ঘুরবে। এটাই বয়ে নিয়ে যাবে মানুষকে তার গ্রহান্তর যাত্রায়। তারপরের অংশটা রকেটের ওজন। আসলে এটাই রকেট। রকেটটা উড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে দরকার। এটাই ওপরের অংশটাকে গতি দেবে। এর মধ্যেই থাকবে তরল জ্বালানির ট্যাঙ্ক। তার সব পেছনে থাকবে মোটর। যেখানে গ্যাস তৈরী হবে।

—তাহলে কোনটার সঙ্গে কোনটার অনুপাত বলছ কাকামণি? মোট তো বার টন হোলো।

—এই বার টনের সঙ্গে অত্যাবশ্যক অংশ আর রকেট খোলের মোট ওজন ৪ টনের ওজনের অনুপাত!

—অর্থাৎ তিন ভাগ আর একভাগ।

—হ্যাঁ।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, আর একটা কী যেন বললি?

—গ্যাসের নির্গমন বেগ। অর্থাৎ গ্যাসটা সেকেণ্ডে কত মাইল বেগে বেরিয়ে যায় তার মাপ।

—আচ্ছা কাকামণি, এই বেগটাই তো রকেটের বেগ। শুধু গতির দিকটা বিপরীত! বলে অমর।

—তা নয়। এই বেগটার উপযুক্ত একটা ওজন-অনুপাত আছে। দু'টো পরস্পরের সঙ্গে একটা গণিতের নিয়ম বাঁধা। অর্থাৎ রকেটের গতি গ্যাসের নির্গমন বেগের সঙ্গে এক হতে পারে তখনই যখন রকেটের মোট ওজন অত্যাবশ্যক অংশ আর খোলের মিলিত ওজনের আড়াইগুণ থেকে তিনগুণের মধ্যে। সূক্ষ্ম সংখ্যাটা গণিত-শাস্ত্রের একটা স্থির সংখ্যা।

—কী সেটা ?

—যখন কলেজে পড়বে তখন সেটা জানবে। এখন আমাদের আলোচনার জন্যে এইটুকুই যথেষ্ট। আর একটা মনে রাখতে হবে, এটা গণিতের নিয়ম। কার্যক্ষেত্রে হিসেবের একটু পরিবর্তন দরকার। কেননা মাটি থেকে ওঠার সময় হাওয়া আর পৃথিবীর টান দু'টোর সঙ্গেই লড়াই করতে হয়।

—ব্যাপারটা জটিল হয়ে গেল। দু'টো জিনিসের ওপর গতিবেগ নির্ভর করছে। একটা হলেই ভালো হোতো।

ঠাকুমা বলেন, ওরে, এক পা থাকলে কি চলা যেতো। দু'টো পায়ে চলতে হয়। ভগবানের যেমন নিয়ম। প্রকৃতিরও তেমনি। এতে সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

—তাছাড়া দু'টো দু'দল বিজ্ঞানীর গবেষণার ফল। ওজনের অনুপাত ইন্‌জিনিয়রদের গবেষণার ব্যাপার। আর নির্গমন বেগ হোলো রসায়নবিদদের গবেষণার বিষয়।

—কিন্তু একটা ব্যাপার তো ভাবা হয় নি, কাকামণি ?

—কী বল্ তো ?

—জ্বালানির তো তাপ আছে ? মনে করো এতো তাপ উৎপন্ন হোলো যাতে রকেট গেল গলে !

—হ্যাঁ, ঠিকই। যত বেশী গ্যাস-নির্গমন বেগ চাইবে তত তাপ যাবে বেড়ে।

ঠাকুমা বলেন, তবু একটা আন্দাজ ক'রে বল্‌তো ! কত বেগের সঙ্গে কতটা তাপ উৎপন্ন হবে ?

—জ্বালানি, তাপ আর গ্যাসের নির্গমন বেগ তিনটের মধ্যেও সম্পর্ক আছে।

—একটা উদাহরণ দাও না, কাকামণি ! অমর অনুরোধ করে।

—মনে কর জ্বালানি নাইট্রোমিথেন (Nitromethane)। চাপ হবে ২১৭৭ ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড) আর গ্যাসের নির্গমন বেগ হবে সেকেণ্ডে ৭২৪০ ফুট।

আবার জ্বালানি যদি তিন ভাগ অক্সিজেন আর একভাগ হাইড্রোজেন হয় তাহলে তাপ হবে ৪৩৯০ ডিগ্রী আর বেগ হবে সেকেণ্ডে ১২,০০০ ফুট।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, সেকেণ্ডে ১২,০০০ ফুট হ'লে—ঘণ্টায় কত হয় রে ?

—ঘণ্টায় ৮ হাজার মাইলেরও বেশী।

—চার হাজার তিনশ নব্বুই ডিগ্রী তাপ কতটা তাপ কাকামণি ?

—ইস্পাত গলে ১৩০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে।

—তা হলে তো সব ধাতুই গলে যাবে, কাকামণি !

—ধাতুর সঙ্গে ধাতুর খাদ মিলিয়ে এমন জিনিস তৈরী হয়েছে যাতে রকেট এই দারুণ তাপও সহ্য করতে পারে।

—আচ্ছা কাকামণি, যখন এই সাংঘাতিক বস্তু ওপরে উঠবে তখন কী রকম দেখতে লাগবে !

—মনে কর এরোড্রোমের মত মহাকাশগামী রকেটের একটা ড্রোম তৈরী হয়েছে। নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা 'কস্‌মোড্রোম'। রকেটটা মনে কর সোজা দাঁড় করানো আছে। নাকটা উঁচু করে। প্রথম যখন ছাড়ল, তখন একটা বিরাট আর্তনাদ উঠল, আর দারুণ শব্দ করে তার লেজের মোটর থেকে বেরিয়ে এল জ্বলন্ত গ্যাস। মনে হোলো এই জ্বলন্ত গ্যাসের সোজা সোজা রণপায়ের ওপর

ওটা দাঁড়িয়ে গেল! তারপর রণপাগুলো তুলে উড়ে চলে গেল শূন্যে; পিছনে ফেলে গেল আগুনের একটা লম্বা মেঘ। প্রথমে মোটরও চলছিল, তারপর যেই পালানোর বেগ পেয়ে গেল অমনি বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

—'পালানোর বেগ' কি কাকামণি?

—ইংরেজীতে Escape velocity। আমি তার বাংলা করলাম পালানোর বেগ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে আগুনের আঙ্গুলের তুড়ি মেরে রকেট চলে গেল তার প্রভাবের বাইরে—মহাকাশ যাত্রায়।

—আচ্ছা কাকামণি, কেমন করে ছাড়া হয়? ছাড়ার তো নিয়ম আছে। হাউই ছাড়ার নিয়ম আছে। রকেট ছাড়ারও নিয়ম আছে নিশ্চয়ই।

—নিশ্চয়ই!

—বলো না কাকামণি।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা কাকামণি, তুমি বললে আসল উপগ্রহ হবে ওর মাথাটা—অত্যাবশ্যক অংশটা। তাহলে বাকী অংশগুলো কোথায় যাবে? জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে মিছিমিছি জ্বালানির খালি ট্যাঙ্কগুলো বয়ে নিয়ে গিয়ে কী লাভ হবে। তার জন্যেও তো শক্তি লাগবে। ফেলে দিলেই হয়।

—কার্যক্ষেত্রে ফেলেই দেওয়া হয়।

ঠাকুমা বলেন, রাস্তায় চলতে চলতে ভার কমাতে থাকে। তীর্থ যাত্রী যেমন পথে যে হাঁড়িতে রান্না করে খায় সেটা ফেলে দিয়ে পথ চলে।

—হ্যাঁ, মা, পথে ভার কমালে বেগও বাড়ে।

—সেই কথাটাই আগে বলো। সুমিত্রার তর সয় না।

—ছোঁড়ার কায়দাটা বলবে না? অমর এটাই আগে জানতে চায়।

—আগে সুমিত্রা যে আলোচনার সূত্রপাত করেছে সেটা

সংক্ষেপে শেষ করে নিই। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে বিচার করলে, রকেটে যদি যথেষ্ট জ্বালানি থাকে তো যে কোনো উচ্চতায় উঠতে পারে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু অন্যরকম দেখা যায়। কেন না, রকেটের গতিবেগ তার খোলে বয়ে নিয়ে যাওয়া জ্বালানির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে।

—কিন্তু আর এক কাজ করা যেতে পারে। রকেটের দেহটার ওজনটা খুব কমিয়ে গ্যাসের বহির্গমন বেগটা বাড়িয়ে দিলে তো হয়। মাথা খাটিয়ে বলে অমর।

—বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন এরকম করে গতিবেগ অর্ধেকের বেশী বাড়ানো যায় না।

—তাহলে তো মুশকিল। তবে কী করা যেতে পারে?

—সাধারণ রকেটে জ্বালানি কমতে থাকলেও তার জ্বালানি ট্যাঙ্কের বহরটা একই থেকে যায় আর তাদি'কে বয়ে নিয়ে যেতে বেশ কিছু শক্তি ক্ষয় হয়। তাই এই খালি ট্যাঙ্কগুলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেহ থেকে খসিয়ে দেওয়াই ভালো।

এই সব ভেবেই একটা নতুন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

ঠাকুমা বলেন, মানুষ তো, কৌশলের অভাব হবে না কোনোদিন।

—হ্যাঁ, মা, তাই! মূল রকেটের গতিবেগ বাড়ানোর জন্যে একটা আলাদা রকেটের সাহায্য নেওয়া হয়। যেই এই দ্বিতীয় সহায়ক রকেটটার জ্বালানি ফুরিয়ে যায়, অমনি তা আপনা থেকে খসে পড়ে যায়।

—অতদূর থেকে কী ভয়ানক জোরে পড়ে। আচ্ছা কারুর মাথায় পড়তে তো পারে—মাথায় না হোক, ঘর-বাড়ির ওপর? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—প্যারাস্যুট জুড়ে দেওয়া যেতে পারে—পড়ার গতিটাকে সংযত

করে রাখতে। দ্বিতীয় রকেটটা খসে যাওয়ার পর মূল রকেটটা চলতে আরম্ভ করে এবং আরও বেগ পেয়ে আরও ওপরে ওঠে।

—তার মানে রকেটটা পর্যায়ে পর্যায়ে ওঠে।

—হ্যাঁ। এ রকম রকেটকে দু' পর্যায়ের রকেট বলা হয়। এমনি ভাবে অনেক পর্যায়ের রকেট তৈরী করা যায়।

—কিন্তু কাকামণি, এরকম বহু পর্যায়ের রকেট তৈরী করলে তার ওজনও যে খুব বেশী হয়ে পড়বে। তাতে যে বেগ কমে যাবে। বেশীদূর তো উঠতে পারবে না।

—এটা ভুল ধারণা। আসলে বিপরীতটাই সত্য।

—তার মানে?

—যে ওজন-অনুপাতের ওপর গতিবেগ নির্ভর করে সেই ওজন-অনুপাতটা আরও সুবিধাজনক হয়ে যায়। মোট ওজন থেকে বিস্ফোরকের ওজন বাদ দিলে যে ওজনটা থাকে সেই ওজনটা যদি মোট ওজনের তুলনায় কম হয়ে আসে তাতে বেগ বাড়ে।

রকেটের পেছনে রকেট জুড়ে দিলে মোট ওজনের তুলনায় বিস্ফোরক যায় বেড়ে।

সবচেয়ে আধুনিক পর্যায়-রকেটে শুধু খালি ট্যাঙ্ক আর পাইপ সরঞ্জামগুলোই যে ফেলে দেওয়া হয় তা নয়, কাজ-ফুরিয়ে-যাওয়া ইঞ্জিনগুলোও ফেলে দেওয়া হয় মাঝ পথে। যে রকেট সব সময় গোটা থাকে তাতে যে ইঞ্জিন থাকে তাকে চলতে হয় অনেকক্ষণ। কিন্তু এই পর্যায়-রকেটের প্রত্যেক পর্যায়ের রকেটে যে ইঞ্জিন থাকে তাকে চলতে হয় অনেক কম সময়। এই রকম কম-সময়-চলার ইঞ্জিন তৈরী করাও সোজা। তা ছাড়া পর পর পর্যায়ের ইঞ্জিনের শক্তি ক্রমাগত কমে আসতে পারে, কেন না গতিপথের মধ্যেই রকেটের মোট ওজন ক্রমশ কমে আসতে থাকে।

—অনেকটা ট্রেনের মতো।

—কতকগুলো ইঞ্জিন যেন একত্রে। পিছনের ইঞ্জিন তার সামনের ইঞ্জিনটাকে ঠেলে দিয়ে খুলে গেল। সেটা খুলে গেলে পরেরটা কাজ আরম্ভ করলে। এমনি করে চলতে শুরু করলে।

—আচ্ছা, কাকামণি, জেট এরোপ্লেনের ইঞ্জিন আর মহাকাশগামী রকেটের ইঞ্জিন—এরা কি একই ?

—একই নিয়মে চলে। কিন্তু তফাত আছে।

—নিয়মটা তো আগে বলেছো।

—হ্যাঁ।

—তফাতটা কোথায় কাকামণি ?

—বলছি। এরোপ্লেন বায়ুস্তরের ভেতর দিয়ে চলে। চলতে চলতে এর ইঞ্জিন বাইরে থেকে বায়ু গ্রহণ করে। এই বায়ুর অক্সিজেন নিয়ে তার দহন কাজ চলে। জ্বালানির সঙ্গে আলাদা করে অক্সিজেন নিয়ে যাবার দরকার নেই।

—কোনদিক দিয়ে বায়ুটা নেয় !

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কী করে অক্সিজেন নাও ?

—কেন ? নাক দিয়ে ?

—মা কিন্তু ঠিক ঠিক অনুমান করতে পারেন। জেট ইঞ্জিন নাক দিয়ে অক্সিজেন নেয়। নাকের ওপর একটা বড় গোল ফুটো থাকে।

ঠাকুমা হেসে বলেন, নাকের ছিদ্র, শুনলি অমর ?

—কিন্তু যত ওপরে ওঠা যায় হাওয়া তো তত পাত্‌লা হয়ে আসে—তাতে অক্সিজেনও থাকে খুব কম পরিমাণে। এত কমে কী করে কাজ চলে ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—প্লেন যখন খুব বেগে ওড়ে তখন এই ছিদ্র দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে ইঞ্জিনে। ঢুকেই একটা যন্ত্রের মধ্যে পড়ে পাত্‌লা বায়ু ঘন হয়ে ওঠে।

—কী যন্ত্র ?

—যন্ত্রটা ঘন করার যন্ত্র—এই যন্ত্রের অনেকগুলো পাখনা আছে যেমন ইলেকট্রিক ফ্যানের পাখনা আছে।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, ব্লেড ? না রে ?

—হ্যাঁ মা, ব্লেড। আর এই ব্লেডগুলো ঘুরতে থাকে মিনিটে ১৪ থেকে ১৫ হাজার বার। যন্ত্রটার নাম কম্প্রেসর (compressor)।

ঠাকুমা কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করেন, গায়ে ফোড়া হলে ডাক্তারবাবুরা যে কম্প্রেস দিতে বলেন সেই কম্প্রেস ?

—কথাটার মিল আছে! মানে হোলো, যা ঘন করে দেয় ; চাপ দিয়ে ঘন করে তোলে! ছড়ানো ফোড়াটাকে এক জায়গায় জড় করে আনে বলে বোধ হয় ডাক্তারবাবুরা 'কম্প্রেস' কথাটা ব্যবহার করেন। আমি ডাক্তার নই। সঠিক জানিনে। তবে জেট ইঞ্জিন বা জেট মোটরের কমপ্রেসরের কাজ—পাত্‌লা হাওয়াকে চাপ দিয়ে ঘন করে তোলা।

—ইঞ্জিন আর মোটর কি একই ? মোটর কথাটার মানে কি, কাকামণি ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—হ্যাঁ একই! মোটর কথাটার মানে যা চলার শক্তি যোগায়!

—ঘন হয়ে যাবার পর বায়ুটা যায় কোথায় ?

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের নাক দিয়ে নেওয়া বায়ুর অক্সিজেন যায় কোথায় সুমিত্রা ?

—বাঃ! তুমি তাও জান না ?

ঠাকুমা হেসে জিজ্ঞাসা করেন, বল্ না!

—ফুসফুসের ভিতর দিয়ে রক্তে মিশে যায়।

ঠাকুমা বলেন, এক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই অমনি কিছু হয়।

—এক্ষেত্রে অক্সিজেন জ্বালানির সঙ্গে মিশে যায়। অক্সিজেনের ছোঁয়ায় জ্বালানি জ্বলে ওঠে, বলে বরেন।

—মোটরের মধ্যে কী জ্বালানিটা জমে থাকে ?

—না আলাদা ট্যাঙ্কে থাকে—সেখান থেকে পাম্প করে একটু একটু করে মোটরের খালি ঘরটায় আনা হয়। এখানেই ঘন বায়ুটাকে পাম্প দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়ঃ তারপর জ্বলন্ত গ্যাস বাইরে বেরোবার মুখটার দিকে খুব জোরে ছুটে যায়!

—অমনি হু হু করে বেরিয়ে পড়ে!

—সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে না। মাঝপথে একটা ব্লেডওলা চাকার সঙ্গে ধাক্কা খায়। এই ধাক্কাতে এই যন্ত্রটা ঘুরে যায়।

—কী নাম এই যন্ত্রটার?

—টারবাইন! এই টারবাইন আবার আগেকার কম্প্রেসারটাকে চালায়।

—বাঃ বেশ ব্যবস্থা তো। যেখানে যতটুকু শক্তি পাওয়া যায় সবটুকুকে নিঃশেষে ব্যবহার করা।

—এটাই প্রয়োগ বিদ্যা—অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়রিং-এর বৈশিষ্ট্য, কিছুই ফেলা যাবে না। এইবার এই টারবাইন পেরিয়ে জ্বলন্ত গ্যাস নির্গমন মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

—আচ্ছা, কাকামণি, এই মুখটা কেমন? নলের মুখের মতো? মোটরের তলায় গ্যাস বেরোবার জন্যে যে লম্বা পাইপটা থাকে তার মুখের মতো?

—না, একটু বৈশিষ্ট্য আছে। দেখতে ফানেলের মতো। গলাটা সরু, মুখটা চওড়া। এই সরু গলাটার থেকে বেরিয়েই একটু বেশী পরিসর পেয়ে গ্যাসটা আয়তনে বেড়ে যায়, তাপ চাপ কমে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের গতিবেগ যায় বেড়ে!

—জেট ইঞ্জিনের চাপ ও তাপ কতো, কাকামণি?

—তাপ? তা প্রায় ১৫০০ ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড) হবে। গ্যাসের বেগ কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার ফুট প্রত্যেক সেকেণ্ডে, আর কম্প্রেসর, টারবাইনের পাখনা বা ব্লেডগুলোর ঘোরার বেগও খুব বেশী, ধরো, সেকেণ্ডে প্রায় ১৫ হাজার বার!

—আচ্ছা, এই ইঞ্জিনে মহাকাশযানের কাজ চলে না কেন ?

—মহাকাশযানকে বায়ুশূন্য রাজ্যে চলতে হয় বলে তার পক্ষে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের ওপর ভরসা করা চলবে না। তাই তাকে সঙ্গে সঙ্গে এমন বস্তু বয়ে নিয়ে যেতে হয় যা জ্বালানিকে পুড়তে সাহায্য করে। এই দাহক যে শুধু অক্সিজেন হয় তাই নয়, অন্য পদার্থও হতে পারে।

এই দাহক বস্তু নাইট্রিক অ্যাসিড হতে পারে, ক্লোরিক অ্যাসিড হতে পারে, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড হতে পারে, আরও অনেক কিছু হতে পারে। এরা সাধারণ তাপ চাপে তরল অবস্থায় থাকে। দহন কাজে কিন্তু এদের সবটা কাজে লাগে না, তাই সব চেয়ে ভাল দাহক খাঁটি অক্সিজেন।

—এত গ্যাস বয়ে নিয়ে যেতে যে প্রকাণ্ড জায়গা লাগবে। মস্ত বড়ো ট্যাঙ্ক। আমি একবার বার্ণপুর লোহার কারখানায় গিয়েছিলাম। সেখানে গ্যাসের ট্যাঙ্ক দেখেছি। সাত তলা উঁচু একটা কাঠামোয় প্রকাণ্ড শাদা ট্যাঙ্ক—অনেক মাইল দূর থেকে দেখা যায়। এত বড়ো ট্যাঙ্ক বয়ে নিয়ে যেতে হবে তো ?

—নারে, অক্সিজেন গ্যাসকে তরল করে জমিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

—এ আবার জলের মতো তরল হয়! অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—হয়, খুব ঠাণ্ডা পেলে হয়। শূন্য ডিগ্রীতে জল বরফ হয়। ১০০ ডিগ্রীতে ফোটে। এই শূন্য ডিগ্রীর নীচে ১৮৩ ডিগ্রী তাপ নামলে তবে অক্সিজেন তরল হয়।

—উঃ কী ঠাণ্ডাই না হবে। আচ্ছা কাকামণি, তার রঙ তখন কেমন হয় ?

—হালকা নীল। ঠিক সকাল হবার আগেই আকাশের যে রঙ হয় তেমনি।

—বাঃ চমৎকার !

ঠাকুমা বলেন, ঘুরে ফিরে দেখি আদিতে সব নীল, নারে ?

—কী জানি মা ! হলেও হতে পারে। তবে নীল রঙটাই প্রকৃতির সবচেয়ে আদরের রঙ।

—আচ্ছা, কী রকম ভারী ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—জলের চেয়ে তেরগুণ।

—আচ্ছা কাকামণি, অক্সিজেন যখন তরল হয়, তখন আরও ঠাণ্ডা করলে জম্‌তেও তো পারে ?

—পারে বইকি !

—কখন জমে ?

—শূন্যের নীচে তাপমাত্রা ২১৯ ডিগ্রী নেমে গেলে। তা যাক্, আকাশযানের মোটরে যে সব জ্বালানি ব্যবহার করা হয় অনেক ভেবে চিন্তে তাদের ঠিক করতে হয়। দুটো গুণ দেখতে হয় তাদের। একটা হোলো—দহনের পর যে গ্যাস বেরোয় তার নির্গমনের বেগ, আর একটা হোলো তার ঘনত্ব অর্থাৎ জলের তুলনায় তার ভার।

প্রথমটার দরকার এই জন্যে যে, আকাশযানের গতি গ্যাসের নির্গমন বেগের ওপর নির্ভর করে। আর দ্বিতীয় গুণটার দরকার ট্যাঙ্ক ছোটো করার জন্যে।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁ রে বরেন, আকাশযানের মোটরের চেহারা কেমন ?

—খুব সরল চেহারা। লম্বাটে মাটির কলসীর মতো—কানা নীচের দিকে, খোলটা ওপরে। অম্‌নি সরু গলা। অম্‌নি চওড়া কানা। গ্যাসটা তৈরী হয় খোলে, বেরোয় মুখটা দিয়ে।

ঠাকুমা বলেন, তাহলে ভেবে দেখ মানুষ যখন কলসী তৈরী করেছে তখন সে নিজের অজ্ঞাতে এমন একটা আকার নিয়েছে যা তার প্রথম আবিষ্কারের হাজার হাজার বছর পরেও কাজে আসছে।

অমর বলে, ঠাকুমা রান্না-বান্না, ঘর-সংসার, এ সব ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। তোমরা কলসীকে যে ভাবে উনুনে বসাও ঠাকুমা, আমরা মহাকাশযাত্রীরা সেই আকারটাকে ঠিক উলটে বসিয়েছি; দেখ্ছ না ?

সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠল।

॥ চার ॥

হাসির ঢেউ মিলিয়ে গেল। অমর গম্ভীরভাবে কাকামণিকে জিজ্ঞাসা করলে, নকল উপগ্রহগুলো কী করে আকাশে স্থাপন করা হয় ? কী করে ছোঁড়া হয় ? খাড়া উপরের দিকে, না একটু কোণ করে ?

বরেন বললে, নকল উপগ্রহগুলো ছোঁড়ার সময় ছুটো দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথম, এটাকে পৃথিবীর পিঠ থেকে কিছু দূর উপরে তুলতে হবে। দ্বিতীয় লক্ষ্য হোলো একে হিসেব মতো একটা বিশেষ গতিবেগ দিতে হবে।

ঠাকুমা বলেন, মাঝারি এক বালতি জল একতলা থেকে তিনতলায় তুলতে দম ফুরিয়ে আসে, পা টন্ টন্ করে। তা এত বড় প্রকাণ্ড একটা বস্তুকে কী করে ঠেলে তোলা যাবে ? কত জোর লাগবে ?

—একটা সুবিধে আছে। একটা ভারী জিনিসকে এক ফুট উঁচুতে তুলতে যে পরিমাণ শক্তি লাগে তার দ্বিগুণ শক্তি ব্যয় করতে হয় তাকে দু-ফুট তুলতে।

কিন্তু এই নকল উপগ্রহকে এক ফুট তুলতে যে শক্তি ব্যয় করতে হয়, দশকোটি ফুট তুলতে সেই শক্তির লক্ষগুণ ব্যয় করতে হয় না, যতটা শক্তি লাগতো তার সাড়ে ষোলভাগের একভাগ মাত্র লাগে।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, এ হিসেব কী করে হোলো ? আবার দেখি দুই-এ দুই-এ সওয়া দুই হয়ে গেল !

—এমন কেন হবে ? সুমিত্রা বুঝতে পারে না।

—যত উঁচুতে ওঠা যায় তত কম শক্তি লাগে বোধ হয়। তা না হলে এমন হিসেব হয় কেমন করে ? অমর বোঝবার চেষ্টা করে।

—ঠিকই বলেছো। পৃথিবী থেকে যত উপরে যাওয়া যায় তার আকর্ষণ তত কমে—যে পরিমাণে দূরত্ব বাড়ে তার চেয়ে বেশী অনুপাতে আকর্ষণ যায় কমে। আর সেই আকর্ষণকে প্রতিহত করতে শক্তিও লাগে কম।

ঠাকুমা বলেন, টানের জোর কমে এলে তাকে এড়িয়ে যেতে শক্তিক্ষয় তো কম হবেই। যতদূরে যাবে, টান তত কমবে, তাই না ?

—ঠিক তাই।

—আচ্ছা, কাকামণি, কতদূর উপরে নকল উপগ্রহটাকে বসাতে হবে ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে—কেউ বলেন পৃথিবীতল থেকে ১২৫ মাইল ওপর দিয়ে গেলেই যথেষ্ট, কেউ বলেন কয়েক হাজার মাইল ওপর।

ঠাকুমা বলেন, বিজ্ঞানের ব্যাপারে মতভেদ কেন রে ?

—এক একজন এক এক দিক বিচার করে বলেন কিনা, তাই !

—তাহলে কি করে ঠিক হবে কোথায় উপগ্রহটাকে বসানো হবে ?

—দুটো দিক বিচার করে ঠিক করতে হবে। প্রথম, উপগ্রহটায় বাড়তি শক্তি মজুত রাখার ব্যবস্থা। দ্বিতীয় দিক হলো উপগ্রহের মোট পরমায়ু।

—আচ্ছা, কাকামণি, পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে, যে কোনো দিকে খুসীমতো উপগ্রহটাকে আকাশে পাঠানো যায় ?

—আচ্ছা, কাকামণি, মোটরের বেলায় যেমন, এই উপগ্রহ পাঠানোর বেলায়ও কি তেমনি ? সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন করে সুমিত্রা ।

—ঠিক কি বলছ ?

—একটা মোটর উত্তর হোক, দক্ষিণ হোক, পুব হোক, পশ্চিম হোক যে দিকেই যায় সে দিকেই তার সমান পেট্রোল পোড়ে। এরোপ্লেনেরও নিশ্চয়ই তাই ।

—উপগ্রহ-রকেটের বেলায়ও নিশ্চয়ই তেমনিই হবে ? অমর উত্তর দেয় ।

—না, তা হয় না। একটা উপগ্রহ-রকেটকে পুব থেকে পশ্চিমের আকাশে পাঠাতে যা জ্বালানি পোড়ে, তার চেয়ে বেশী জ্বালানি পোড়ে, যদি তাকে পশ্চিম থেকে পুবে পাঠানো যায়। আবার পৃথিবীর কোমর থেকে ছুঁড়লে যে জ্বালানি খরচ হয়, তার চেয়ে বেশী জ্বালানি খরচ হয়, তাকে পৃথিবীর মাথা থেকে ছুঁড়লে ।

শুধু ছোঁড়ার দিকই নয়। উপগ্রহ-রকেট আকাশে পাঠানোর স্থানটাও ভেবে চিন্তে স্থির করতে হয় ।

রকেটের বেগ সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল হলেও তা যদি মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে ছোঁড়া হয়, তাহলে সেটা নকল উপগ্রহে পরিণত হয়। কিন্তু এই হিসেবে একটু ভুল আছে ।

—ভুল ? অমর বুঝতে পারে না ।

—ধরে নেওয়া হয়েছিল যে পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘোরে না ।

—কিন্তু পৃথিবী তো ঘোরে।

—ঘোরে তো বটেই। পৃথিবীর পিঠের ওপর প্রত্যেক বিন্দুর আলাদা আলাদা নিজস্ব বেগ আছে, যে বেগে তা শূন্যে চলেছে ।

—আচ্ছা, কোমরের বিন্দুগুলোর বেগ কতো ? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা ।

—তুই কোমর বলছিস কেন? বল নিরক্ষরেখা। অমর সংশোধন করে দেয়।

ঠাকুমা বলেন, না ভাই, অত শক্ত কথা আমার মনে থাকবে না। যক্ষ, রক্ষ শুনেছি—একথাটা শুনি নি।

ঠাকুমা হেসে উঠলেন।

—তাই হোক। পৃথিবীর কোমরের ওপর যে কোনো বিন্দুর বেগ সেকেণ্ডে ৪৬৫ মিটার। আর উত্তর মেরুতে শূন্য।

—পৃথিবীর বেগের সঙ্গে উপগ্রহ-রকেটের বেগের কি যোগ বিয়োগ হয়? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—হ্যাঁ। মনে কর উপগ্রহটা ছোঁড়া হোলো নিরক্ষরেখা—না, পৃথিবীর কোমরের ওপর একটা স্থান থেকে খাড়া পুব দিকে—যেদিকে পৃথিবী নিজেই ঘুরছে নিজের মেরুদণ্ড ঘিরে—তাহলে উপগ্রহ হতে গেলে রকেটটার বেগ যদি সেকেণ্ডে পাঁচ মাইলের থেকেও কম হয়—তাহলে তার কাজ চলে যাবে। পশ্চিম থেকে পুবে অর্থাৎ পৃথিবী ঘোরার উলটো দিকে ছুঁড়লে সেকেণ্ডে পাঁচ মাইলের ওপর ঐ পরিমাণ বেগ বেশী চাই। আরও বেশী বেগ মানে আরও বেশী জ্বালানি, আরও নানান জটিলতা। পৃথিবীর এই দৈনিক আবর্তনের বেগটাকে কাজে লাগাতে হলে উপগ্রহ-রকেটকে নিরক্ষবৃত্তের কোনো বিন্দু, অর্থাৎ জায়গা থেকে ছুঁড়তে হবে।

—কখন এই বেগটাকে পুরো কাজে লাগাবার চেষ্টা হয়? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—যদি নকল উপগ্রহটাকে দুটো গ্রহের মাঝামাঝি স্টেশনের কাজ করতে হয় তাহলে সেটাকে যতদূর সম্ভব পৃথিবীর কোমর থেকে ছুঁড়তে হয়।

—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে পৃথিবী নাচ্‌নী, কোমরে একটা সোনার গোট—তার থেকে হীরের টুক্‌রো, মণির টুক্‌রো ছিট্‌কে

পড়ছে চারদিকে, ছিট্‌কে পড়ে চাঁদের মতো তার চারদিক ঘুরছে। সুমিত্রা কল্পনায় একটা বিচিত্র ছবি আঁকে।

অমর ধমক্‌ দিয়ে তাঁকে চুপ করতে বললে, কী তুই গোলমাল করছিস ? তোদের জন্যই তো ভারতবর্ষে বিজ্ঞান এগোয় নি—ভাল মানুষরা মন্দির বানিয়েছে আর ঠাকুর বানিয়েছে।

—কথাটা ঠিক বললে না, অমর ! তিল তিল করে মানুষ এই সব বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেছে। ভারতবর্ষেও এই জ্ঞানতৃষ্ণার অভাব ছিল না। ভারতীয়রা জ্যোতির্বিজ্ঞানে খুব অগ্রসর ছিলেন। কেপলারের নিয়মগুলি কেপলারের বহু পূর্বে ভারতবর্ষের জ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন।

ঠাকুমা সাগ্রহে বলেন, আজ ঐ কথাটাই বলো বরেন !

—থাক্‌ মা, পরে বলবো।

—আচ্ছা, কাকামণি, এই নকল উপগ্রহগুলোকে কি গতিপথে ছোঁড়া হয় ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—নানান ধরনের গতিপথে ছোঁড়া হয়। এই গতিপথ কখনো বৃত্তের মতো সম্পূর্ণ গোল, কখনো আধা গোল-ডিমের আকারের—কখনো তাকে সোজা তুলে দেওয়া হয় সিলিং পর্যন্ত—তারপর চালিয়ে দেওয়া হয় পৃথিবীর পিঠের সঙ্গে সমান্তরাল দিকে।

—সিলিং কি কাকামণি ?

—সিলিং হোলো উপগ্রহের গতিপথের সবচেয়ে বেশী উচ্চতা পৃথিবীর পিঠ থেকে। এই ধরো চাঁদ, ও যে পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে সেই পথের সবচেয়ে বেশী দূরত্ব হোলো ওর সিলিং (Ceiling)। তা যাক, কখনো কখনো উপগ্রহ-রকেটটাকে সেরেফ গোলার মত ছোঁড়া হয়—পৃথিবীর তল আর খাড়া উঁচু দিক এ-দুটোর মাঝামাঝি। এটার সুবিধে অন্য কায়দাগুলোর থেকে বেশী। এতে বেশী বেগ পাওয়া যায়। আর একটা ছোঁড়ার নিয়ম আছে

যেটা বললে ঠাকুমা এখনি বলবেন "আবার দুই-এ দুই-এ সওয়া তিন করলি ?"

ঠাকুমা বলেন, হ্যাঁ, ঐটেই একটু বাড়িয়ে বল। আমি বাবা সংসারের হিসেব করতে করতে হয়রান হয়ে গেছি। আমার খরচের খাতায় যদি তোদের অঙ্কের হিসেবে চারে চারে পাঁচ হতো তাহলে মাসের শেষে আর কষ্ট করতে হতো না।

—ঠাকুমা বড়ো অবৈজ্ঞানিক কথা বলে, কাকামণি। ঠাকুমা কোনোদিনই বিজ্ঞান বুঝবে না। বলে অমর।

সুমিত্রা বলে, তুই চুপ কর দেখি। বলো কাকামণি, এই নিয়মটাই বেশী কাজের হবে। যেখানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মাইল যেতে হবে সেখানে এ-রকম হিসেবের সুবিধে নাহলে চলবে কেন ? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দূরত্ব যেখানে পার হতে হবে সেখানে একটু হিসেবের লাভ না হলে চলবে কেমন করে ?

বরেন বলে, ব্যাপারটা বেশ মজার। ধরো কেউ যদি বলে দিল্লী যেতে গেলে পিকিং দিয়ে ঘুরে আসা সুবিধে, তাহলে তোমার কী মনে হবে ?

—আমার মনে হবে তার মাথা খারাপ। এতটা পথ ঘুরতে গেলে জ্বালানি তো বেশী পুড়বেই। মিছিমিছি জ্বালানি নষ্ট করে কি লাভ ? জবাব দেয় অমর।

—এই ঘুরপথে কিন্তু জ্বালানি খরচ কম পড়বে। তাছাড়া মোট বেগ কম লাগবে।

—মোট বেগ মানে ?

—মোট বেগের হিসেব করতে হয় উঁচু দিকের গতিবেগের সঙ্গে পৃথিবী পিঠের সঙ্গে সমান্তরাল দিকের গতি যোগ করে। এটাকে বলে ঘুরপথ। এই কায়দা খুব কাজে আসবে যদি পৃথিবী থেকে নকল একটা নতুন উপগ্রহে যেতে হয়। নতুন কেন, পুরোনো উপগ্রহে যেতে গেলেও এতে সুবিধে হবে।

—উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। বুঝতে পারছি না। ছবি এঁকে বুঝিয়ে দাও।

ঠাকুমা বলেন, রাত্রির বেলায় আর শ্লেট পেন্সিল আনিস্ না বাপু। আমি চোখে কম দেখি, দেখতে পাবো না। আমাকে এমনি কথায় বুঝিয়ে দে।

—ধরো, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে মাটির ওপর পর্যন্ত মাপটাকে একক ধরলাম।

ঠাকুমা বলেন, হ্যাঁ ভালই করলি, এ হিসেবটা সুবিধের। মানুষের বেলায় তোর ফুট গজের চেয়ে তার হাতের মাপটা ভাল বুঝতে পারি। তোর এই মাপটা তেমনি পৃথিবীর হাতের মাপ বলতে পারিস।

—ধরো, কোনো উপগ্রহ পৃথিবী থেকে এই এককের পঞ্চাশ গুণ দূরে ঘুরছে কোন গোল পথে।

এখন মনে করো ঐ উপগ্রহটাতে আমাদের পৌঁছতে হবে! কী করা যাবে ?

—কেন সোজা উঠে যাবো কিংবা একটু জ্বালানি বাঁচাবার জন্যে ধনুকের মতো বাঁকা পথে পেঁাছে যাবো। উত্তর দেয় অমর।

—আমি বলি অন্য রকম। ধরো, আমরা ধনুকের মত পথে এই মাপের একশগুণ ওপরে উঠে পড়লাম। তারপর আবার একটা আরও বড় ধনুকের মতো পথে উপগ্রহের দিকে নেমে এলাম। একশগুণ ওপরে উঠলে সেখানের গতিটা কম। উপগ্রহের কাছে পেঁাছে গতিটা বাড়িয়ে দিয়ে উপগ্রহের গতির সঙ্গে সমান করে নিলাম।

—সুবিধে কি হলো ?

—সুবিধেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি শোনো। মনে কর মহাকাশযানের চালক উঠ্তে উঠ্তে দেখলে জ্বালানি কমে এসেছে, আর নতুন বেগ সৃষ্টি করে উপগ্রহের সঙ্গে তার বৃত্তাকার পথে পাল্লা দিতে

পারবে না। তখন করলে কি, ওপরে উঠে গেল, যখন তার পথের সবচেয়ে দূর জায়গায় পৌঁছল (গতি পথের দূর বিন্দু 'এপোজী') তখন ইঞ্জিনের সাহায্যে গতি দিলে কমিয়ে, তারপর ছোঁ মেরে নেমে এল নীচের দিকে উপগ্রহের দিকে—কাছাকাছি এসে সামান্য যেটুকু জ্বালানি ছিল তাই দিয়ে আরও একটু বেগ তৈরী করে ভিড়ে পড়ল তার সঙ্গে। হিসেব করে দেখা গেছে এই ঘুরপথে মোট বেগ লাগে কম, জ্বালানিও বাঁচে। এটা অঙ্কের হিসেব।

অনেক বিজ্ঞানী এই রকম ঘোরাপথের ব্যবস্থা করেছেন চাঁদে, পৌঁছবার জন্যে কিংবা দুই গ্রহের মাঝখানে শূন্যে পাড়ি দেবার জন্যে।

—আচ্ছা, এতে কি সব চেয়ে কম জ্বালানি লাগে ?

—না।

—তবে কোন্ পথে গেলে সবচেয়ে কম জ্বালানি পোড়ে ?

—সে পথের হিসেবটা বেশ জটিল। এই পথে যেতে গেলে রকেটটাকে তার পথের প্রত্যেক বিন্দুতে গতিবৃদ্ধির দিক বদলাতে হবে। অর্থাৎ গতিটাকে একই দিকে বাড়িয়ে গেলে চলবে না। যে দিকে গতি বাড়বে সেই দিকটাকে ঘড়ির কাঁটার মত বদলে বদলে যেতে হবে।

—এই পথটার কী নাম ?

—এই পথটাকে বলে Optimum Trajectory।

—আবার ইংরেজী ? ঠাকুমা বলে ওঠেন।

—বলতে পারো সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে সুবিধের পথ। আসল কথা রকেট যখন ওঠে তখন তাকে দুটো জোরকে কাটিয়ে যেতে হয়। একটা হোলো পৃথিবীর টানের জোর আর একটা বায়ুর জোর। রকেটের গতি যত তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে, তত তাড়াতাড়ি এটা দরকার-মতো গতি পেয়ে যাবে আর, তত তাড়া-

তাড়ি সিলিং-এ উঠে যাবে। এতে জ্বালানি পুড়বে কম। কিন্তু, অন্যদিক দিয়ে মুশকিল আছে। গতিবেগ যত তাড়াতাড়ি বাড়বে, বায়ুর বাধা তত বেড়ে যাবে, আর তত বেশী জ্বালানি পুড়বে।

—তাহলে কী করা যাবে, কাকামণি! অমর ভেবে এই সমস্যার সমাধান পায় না।

—শুনে মনে হচ্ছে অমরলাল আকাশযানে বসে বসে ষ্টীয়ারিং-এ হাত রেখে ভাবছে। সুমিত্রা হেসে বললে।

—হ্যাঁ, ভাবছিই তো?

ঠাকুমা বলেন, না, তা নয়, ও এখন উঠবে; ভাবছে, কোন পথে গেলে খরচ পড়বে কম!

—হ্যাঁ, ঠাকুমা ঠিক!

বরেন বললে, হিসেব করে দেখা গেছে একটা উপায় আছে। প্রথমে একটা কোণ করে রকেটটা ওঠে; তারপর বেগটা যথেষ্ট পড়ে গেলে রকেটটা ঘুরে যায় যাতে ইঞ্জিনের সুমুখের ধাক্কাটা পৃথিবীর পিঠের সমান্তরাল দিকে লাগে। এর ফলে হয় কি, রকেট সোজাদিকে গতি পেতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে আগেকার বেগের দরুণ আপনা থেকে উপরে উঠ্‌তে থাকে—'ঝোঁকের' ওপর। এই ভাবে সে গোলপথে ঘোরার উপযুক্ত বেগ পেয়ে যায়।

—যন্ত্রের আবার 'ঝোঁক' কি কাকামণি?

—আচ্ছা, একটা কথা ভেবে দেখ দিকি। খুব জোরে ছুটতে ছুটতে তুমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতে পারো?

—না। দাঁড়াতে গেলে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবো।

—এটাই হোলো গতিশীলতার ঝোঁক। ইংরেজী নাম 'ইনারসিয়া' (Inertia of motion)।

—আচ্ছা কাকামণি, খুব বড় একটা উপগ্রহকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে পাঠিয়ে ওপরে জোড়া যায় না?

—অবাক করলি তো প্রশ্নটা করে? নিশ্চয়ই যায়। এই ভাবেই

তো গ্রহান্তর যাত্রার পথের মধ্যে স্টেশন তৈরী করার চেষ্টা চলছে। অনেকগুলো রকেট এক সঙ্গে জুড়ে খুব বড় প্রকাণ্ড রকেট তৈরী করা যাবে ওপরে।

—জুড়ে দেওয়া যাবে? এ কী করে হবে?

—ধরো পাশাপাশি রেলে দুটো ট্রেন একই বেগে একই দিকে চলেছে। দু' ট্রেনের প্যাসেঞ্জার চায়ের পেয়ালা, আপেল, খানা সবই একটা ট্রেনের জানালা দিয়ে অন্য ট্রেনে চালান করে দিতে পারে। তাছাড়া মুখোমুখি দুটো দরজাকে যদি কাঠের পাটা দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে এক ট্রেন থেকে অন্য ট্রেনে অবলীলাক্রমে যাতায়াতও চলে। ঠিক এমনি ভাবেই রকেটের সঙ্গে রকেটে যোগ করা হবে।

—এতো সোজা?

—না অতটা সোজা নয়। খুবই শক্ত। পরে আলোচনা করা যাবে।

—তুমি যে বললে কাকামণি, পাশাপাশি দুটো চলন্ত ট্রেনের বেগ একই হলে দুটোর মধ্যে যাতায়াত যেমন সোজা তেমনি নাকি দুটো চলন্ত রকেটের মধ্যে যোগাযোগও সম্ভব। কে যোগাযোগ করবে?

—কেন, মানুষ?

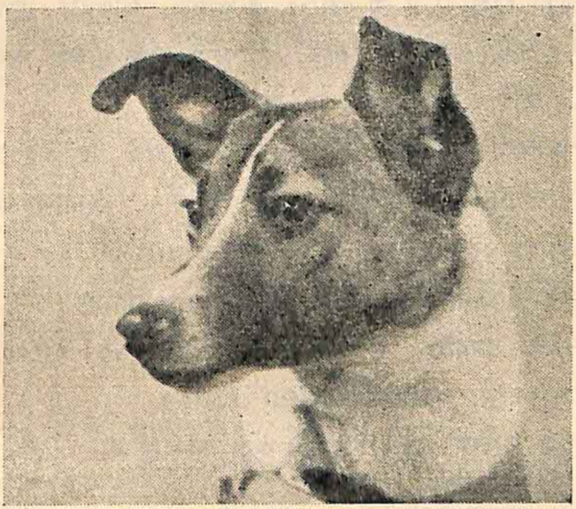
সুমিত্রা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, মানুষ? মহাশূন্যে মানুষ থাকবে কী করে? মানুষ কী করে নড়বে-চড়বে? কী খাবে? কী করে কাজ করবে? মহাশূন্যে মানুষের কেমন লাগবে?

—আচ্ছা, এবার এই বিষয়েই আলোচনা করা যাবে। আগে মহাশূন্যে মানুষের ব্যবহার না জানলে, মানুষ যাবে কী করে সেখানে?

ঠাকুমা বলেন, শুধু চন্দ্র ছুঁড়ে আকাশ ভর্ত্তি করে কী লাভ? মানুষ যদি সেখানে না যেতেই পারল?

—ঠিক বলছো, মা। মানুষ যদি নিজেই যেতে না পারলো তবে কী লাভ? নিজে যাবে বলেই তো ইঁদুর পাঠাচ্ছে, বাঁদর পাঠাচ্ছে, কুকুর পাঠাচ্ছে।

ঠাকুমা বলেন, মানুষ তো ইঁদুর বাঁদর কুকুর নয়? আরও বেশী। তাকে ঐ শূন্যে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। ওখানে ইষ্টিশান তৈরী করতে হবে—সেখান থেকে গ্রহে গ্রহে জাহাজ ছাড়তে হবে। আরো বেশী কাজ আছে তার। যাবার আগে জরীপ চাই। যাবি যদি, তো জরীপ করেছিস।



প্রথম মহাকাশযাত্রী, 'লাইকা'।

—জরীপ চলেছে সমানে। তাছাড়া অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলেছে মহাশূন্যে মানুষের কী অবস্থা হতে পারে তা জানতে।

ঠাকুমা বলেন, এবার শুনে বুঝবো, মানুষ একদিন মহাশূন্যে আসুক, এ কামনা ঈশ্বরের ছিল কিনা।

—ঠাকুমা, তোমার ঐ কথায় কথায় ঠাকুর আর ঈশ্বরের নাম করা বন্ধ করো, বলে অমর।

—এই রে, আবার নাতি ঠাকুমাতে লেগে গেল বুঝি।

—না, আমি লাগবো না। আমাকে আজ সব শুনতে হবে। অমর গম্ভীর হ'য়ে বলে।

॥ পাঁচ ॥

আবার আলোচনা শুরু হল।

সুমিত্রা বলে, তুমি যে বললে, কাকামণি, পৃথিবীর উপগ্রহ হতে হলে রকেটের বেগ হতে হবে সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় আঠার হাজার মাইল।

—আচ্ছা, কাকামণি, ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো এই বেগ পেয়ে যায় না রকেটটা ; সময় তো কিছুক্ষণ লাগে ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—লাগে বইকি। তা মিনিট কয়েক লাগে।

ঠাকুমা বলেন, বলিস কি ? মাত্র কয়েক মিনিট ?

—এই সময়টা নির্ভর করে বেগ বৃদ্ধির হারের ওপর—একসিলারেশনের (acceleration) ওপর।

ঠাকুমা বলেন, তোর ইংরেজী কথা বুঝলাম না। বেগ বৃদ্ধির হার আবার কি ?

—ঠাকুমা, বুঝি মনে করেছো সুদের হার ? অমর ঠাকুমাকে একটু খোঁচা দেবার চেষ্টা করে।

বরেন বলে, ঠিক বলেছিস অমর। সুদ আর সুদের হার এই দুটো উপমা দিয়ে একসিলারেশন বোঝানো সোজাই হবে।

ঠাকুমা হেসে নাতির দিকে চেয়ে একটা চোখ মট্‌কে বললেন, দেখলি তো, অনেক জানার পর আমার চুল পেকেছে!

ঠাকুমার কথায় যেন কান দিলে না এই রকম ভাব নিয়ে অমর বললে, কী রকম করে বোঝাবে, কাকামণি ?

—আসল টাকার ওপর সুদ জমে সময় পেরিয়ে গেলে। সমান সমান সময়ের জন্যে সমান সমান সুদ। এই সুদেরও একটা হার থাকে শতকরা পাঁচ—পাষণ্ডরা শতকরা পঞ্চাশও নেয়। এটা সরল

সুদ। যখন সুদের সুদ জমে সেই সুদকে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলে। এরও হার থাকে। হারটা যতক্ষণ সমান থাকে, ততক্ষণ বলতে পারো ধারের, একসিলারেশন সমান। কিন্তু যখন সেই সুদের হারটাও প্রতি মুহূর্তে ধরো এই মুহূর্তে শতকরা পাঁচ, পর মুহূর্তে সাত, তার পর মুহূর্তে দশ···এমনি—তখন বলা যায় ক্রমবর্দ্ধমান একসিলারেশনে টাকাটা বাড়ছে।

রকেট ছুঁড়লে তা এই রকম ক্রমবর্দ্ধমান একসিলারেশনে চলে। অর্থাৎ বেগটা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে। চক্রবৃদ্ধির হারটাও বাড়ে প্রতি মুহূর্তে, প্রত্যেক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশে। আর এই চক্রবৃদ্ধির হারটার ওপর নির্ভর করে কতটা সময় লাগবে রকেটটার 'পালানোর বেগ' (Escape velocity) তৈরী হতে।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, 'পালানোর বেগ' মানে, পৃথিবীর টান কাটিয়ে যাওয়ার বেগ তো ?

—হ্যাঁ।

—কী রকম হিসেব কাকামণি ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—হিসেবের জন্যে বেগের এই চক্রবৃদ্ধির হার একটা বাঁধা মাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই মাপ হলো সেকেণ্ডে ৩২ ফুট। ঢিল ছুঁড়লে তার গতি কমে সেকেণ্ডে ৩২ ফুট করে। এই মাপটা অবশ্য সব জায়গায় সমান নয়—যত উপরে উঠবে তত কমবে—৩১, ৩০, ২৯·····এমনি করে কমতে কমতে প্রায় শূন্যে এসে ঠেকবে। তার মানে ছোঁড়ার মুহূর্তের পরই সবচেয়ে বেশী চক্রবৃদ্ধি হারে বেগটাকে বাড়তে হবে রকেটটাকে তাড়াতাড়ি তার সিলিং-এ পৌঁছে দিতে।

—হিসেবে কতটা সময় লাগে তার সিলিং-এ পৌঁছতে ?

—পৃথিবীর টানের জন্যে যে একসিলারেশনে বেগ কমে তার মাপকে বলে 'জি' (g)—অর্থাৎ সেকেণ্ডে ৩২ ফুট। একসিলারেশন যদি 'জি' এর তিনগুণ হয় তাহলে 'পালানোর বেগ' জন্মাতে

সময় লাগে ৯ মিনিট ৩১ সেকেণ্ডে। আর 'জি' এর দশগুণ হলে সময় লাগে ২ মিনিট ৬ সেকেণ্ড।

—এত কম সময়ে এই বেগ তৈরী হয়ে যায় ?

—হ্যাঁ।

সুমিত্রা অবাক হয়ে বলে, এত তাড়াতাড়ি বেগ বাড়লে মানুষ কী করে সহ্য করবে ? হঠাৎ ট্রেন ছাড়লেই তো বেশ ধাক্কা লাগে। এত জোরে বেগ বাড়লে মানুষ সহ্য করবে কেমন করে ? তাছাড়া ঘণ্টায় আঠার বিশ হাজার মাইল বেগ—ওরে বাবা! কী করে সহ্য হবে ?

বরেন হেসে বললে, বেগ যতোই বেশী হোক মানুষ তা অনুভব করে না। তাতে তার ক্ষতিও হয় না। আমরা যে মাটির উপর থেকে পৃথিবীর সঙ্গে শূন্যপথে সূর্যের চারদিকে সেকেণ্ডে সাড়ে আঠারো (১৮½) মাইল বেগে ঘুরছি, তা কি বুঝতে পারি ? আসলে অস্বস্তি হয় অন্যান্য কারণে। চোখ, কান, ত্বক এদের ওপর নানা রকমের পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে বলেই অস্বস্তি হয়। আসল সমস্যা এই বেগ বাড়ার চক্রবৃদ্ধি হারটা।

মানুষের পক্ষে শূন্যে পাড়ি দেওয়ার সময় প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে—

অমর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, কি, কি কাকামণি ?

—মোটামুটি এই কটা। প্রথম সমস্যা হোলো রকেট ছাড়ার মুখে যে ভীষণ হারে বেগ বাড়বে তার ধাক্কা সামলানো। তারপর ওপরে উঠে গেলে সমস্যা হবে—'ভারহীন' হয়ে থাকার সমস্যা—অর্থাৎ বেগ কমার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। একই বেগে যখন পরিক্রমা করবে পৃথিবীর টানের বাইরে, তখনকার অবস্থায় সে থাকবে ? তারপর 'মহাজাগতিক রশ্মি'—কসমিক রে।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, সে আবার কী রে ?

—একে একে সব কথাই বলব। প্রথমে এই যাত্রার পর

কয়েক সেকেণ্ডের কথা বলবো। যখন অত্যধিক হারে বেগ বাড়ে সেই সময়ে মানুষের অবস্থা।

অমর জিজ্ঞাসা করে, কী করে জানা যাবে? মানুষ তো এখনো শূন্যে সশরীরে উপস্থিত হয় নি; বুঝবে কেমন করে?

—অনেক রকমে পরীক্ষা করে দেখেছে। যেমন ধরো মানুষকে সেন্ট্রিফ্যুগাল যন্ত্রে চাপিয়ে দেখেছে। জেট প্লেনে বহুদূর মানুষ পাঠিয়ে দেখেছে, কুকুর ইঁদুর বাঁদর পাঠিয়ে দেখেছে রকেটের সঙ্গে।

—সেন্ট্রিফ্যুগাল যন্ত্র আবার কি?

—চাকার মতো খুব জোরে ঘুরতে থাকা একটা যন্ত্র!

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, যাঁতার মতো?

অমর এবার যেন চটে গেল! বললে, ঠাকুমা কেবল ঘর-সংসারের জিনিস টেনে আনেন! কোথায় আলোচনা হচ্ছে আকাশের বিজ্ঞান, ঠাকুমা বললেন যাঁতা!

সুমিত্রা বলে, ঠাকুমা নিশ্চয়ই ঠিক বলেছেন। না, কাকামণি?

বরেন হেসে বললে, ঠিকই! যাঁতার উপরের পাথরখানা ঘোরে বলেই তো কলাইয়ের দানা, পেষা গম, এগুলো কাণার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়!

আসল নিয়মটা হোলো এই। একটা চাকা যদি জোরে ঘোরে আর তুমি তার কাণায় বসে থাকো (বা যেকোন জায়গায় বসে থাকো) তাহলে বাইরে ছিট্‌কে পড়ার একটা প্রবল বেগ অনুভব করবে!

এই রকম যন্ত্র খুব জোরে ঘুরিয়ে তার কাণায় মানুষ বসিয়ে দেখা গেছে যে কোনো কোনো মানুষ '১৭ জি' পর্যন্ত একসিলারেশন সহ্য করতে পেরেছে! এই যন্ত্রের সাহায্যে যে একসিলারেশন উৎপন্ন করা হয় সেই একসিলারেশন রকেট ছাড়ার মুহূর্তের একসিলারেশনের মতোই! তাই এই পরীক্ষা করা হয়েছে!

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে, সবাই সহ্য করতে পারে কাকামণি?

—কেউ কেউ পারে না। এটা অবশ্য অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।

—আচ্ছা, কাকামণি! 'ভারহীন' হয়ে যাওয়া কী রকম? দেহ থাকবে অথচ ভার থাকবে না, এটা তো বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা! এটা কী করে সওয়া যায়? আর, এই অবস্থাটা তৈরীই বা হয় কী করে?

—মনে কর, তুমি একটা 'লিফ্‌টে' চড়ে একটা চোদ্দতলা বাড়িতে উঠ্‌ছ। বারতলায় উঠে মনে কর যন্ত্র গেল বিকল হয়ে। লিফ্‌টটা সোজা নীচে নামতে লাগল পৃথিবীর টানে! সঙ্গে সঙ্গে তুমিও নামতে আরম্ভ করলে! লিফ্‌টের মেঝেতে তোমার পায়ের চাপ লাগছে না মোটেই! চাপ আছে কি নেই তুমি বুঝতেই পারছো না! এমন কি তুমি বুঝতেই পারছো না, তুমি উঠ্‌ছো না নামছো!

মনে কর এই সব ব্যাপারের তুমি কিছুই জান না। তোমার এই অবস্থাটা 'ভারহীন' অবস্থা! বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হবে 'শূন্য-জি' (Zero-g) অনুভব করছো!

—ওরে বাবা! কী ভয়ানক!

—ওটা তোমার ভয়! মাটিতে পড়ে তুমি ভেঙে চুরমার হয়ে তালগোল পাকিয়ে মরে যাবে এই ভাবনাটাই বিষম ভয়ের! তাছাড়া, যদি চোখ মেলে দেখো দূরে কাছে জিনিসের স্থান বদল হচ্ছে, হাওয়ার বেগ লাগছে গায়ে, শাঁশাঁ শব্দ হচ্ছে, তাহলেই তুমি ভয় পেয়ে যাবে! এ সবের যদি কিছুই না ঘটে তাহলে কেমন লাগবে তোমার বলতে পারো?

—তা অবশ্য পারি নে!

—ভার তো পৃথিবীর টান! পৃথিবীর টান না থাকলে ভারও নেই।

—কিন্তু যে অবস্থাটার কথা বললে সে অবস্থায় পৃথিবীর টান তো রয়েছে!

—বিনাবাধায় ক্রমাগতঃ পড়তে থাকলে যে অবস্থাটা হয় তার সঙ্গে ভারহীন অবস্থার মিল আছে তাই উদাহরণটা দিলাম।

—এতে মানুষের ক্ষতি হয় না ?

—যাঁরা মানুষের শরীরের বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা বলেন ভারহীন হলে মানুষের বিশেষ কিছু এসে যাবে না।* ধরো হার্ট! হার্ট যতটা শক্তি প্রয়োগ করে তার বেশীরভাগ ব্যয় হয় রক্তবাহী নলগুলোর গায়ে উৎপন্ন বাধা অতিক্রম করতে। তা ছাড়া নিঃশ্বাস নেওয়া, আহার গিলে নেওয়া, মলমূত্র ত্যাগ করা—এসব কাজ পেশীর সঙ্কোচনের উপর নির্ভর করে। তার সঙ্গে ভারের কোনো সম্পর্ক নেই!

ঠাকুমা বলেন, দেখা যায় গরু ঘোড়া এরা তো মাটিতে মুখ নীচু করে ঘাস খায়, আর সেই ঘাস বা অন্যান্য জিনিস আপনা থেকে উপরে উঠে তাদের পেটে চলে যায়!

—হ্যাঁ, মা তাই!

অমর বলে, কিন্তু, এটা তো পরীক্ষা নয়। এটা অনুমান!*

—সত্যিকারের ভারহীনতার পরীক্ষাও করা হয়েছে! এরোপ্লেনের মধ্যে এই রকম অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে!

ধরো তুমি একটা এরোপ্লেনে চড়ে প্রবলবেগে নামতে আরম্ভ করলে—নামতে নামতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলে, আর এরোপ্লেনের নাকের ডগাটা দিলে একটু উঁচু করে। এ অবস্থায় এরোপ্লেনটা একটা উটের পিঠের মত পথে চলবে। প্রথমে ভেসে উঠবে তারপর নামবে। যতক্ষণ ভেসে উঠল ততক্ষণ নামার পর আবার ইঞ্জিন দিলে চালু করে! এই উটের পিঠের মত পথে ভেসে উঠে নেমে যাবার সময় ভার নেই মনে হবে। এ অবস্থায় ৩০।৩২ সেকেণ্ড সময়ের জন্য কী হয় তা পরীক্ষা করে দেখা গেছে!

—কী রকম লাগে ?

---

*পরিশিষ্ট দেখুন

—একজন বৈজ্ঞানিক অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বলেছেন যে পরীক্ষাধীন ব্যক্তিদের বেশীর ভাগই আরাম অনুভব করেছেন। কয়েকজন অবশ্য অস্বস্তি অনুভব করেছেন। মনে হয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা বিশেষ বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি করে!

ঠাকুমা বলেন, তা হবে! আমাদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা শারীরিক সংস্কার আছে। ধরো, কেউ যেমন মাছ সহ্য করতে পারে না। কেউ উঁচু থেকে নীচে চেয়ে দেখতে পারে না। তেমনি বোধ হয়!

—আমারও তাই মনে হয়। মোটকথা মানুষের শরীর মহাকাশ ভ্রমণের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত নয়। উপযুক্ত ব্যবস্থা করলে তার পক্ষে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়া সম্ভব!

যতক্ষণ ইঞ্জিন চলে—বেগ বাড়ে—ততক্ষণ ঝঞ্চাট নেই। ইঞ্জিন বন্ধ হলেই মনে হয় ভারহীন। রকেট যখন ইঞ্জিন বন্ধ করে ওপরে ওঠে বা নীচে পড়ে, উভয় সময়ই, মনে হবে পড়েই যাচ্ছি, মনে হবে কোনো ভার নেই যেন।

ইঁদুর, বাঁদর, কুকুর এদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে তিনচার মিনিট ভারহীন অবস্থায় থাকার জন্য তাদের শারীরিক ক্রিয়ায় কোনো গোলোযোগ ঘটে নি।

—আচ্ছা, কাকামণি, রকেটের খোলের ভিতরে যদি কেউ ঘোরাফেরা করতে চায়, পারবে সে?

—না, এ অবস্থায় হাঁটতে পারবে না। কেননা, যার উপর সে দাঁড়িয়ে আছে তার ওপর কোনো চাপই পড়ছে না যে। অবশ্য দেওয়াল আঁকড়ে এদিক-ওদিক একটু নড়াচড়া করতে পারবে।

অমর হঠাৎ বলে বসল, এবার আমি একটা প্রশ্ন করব! দাও, কী জবাব দেবে?

—কী এমন প্রশ্ন রে?

—আচ্ছা, মনে কর, কাকামণি, পাইলট দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল এই ভারহীন অবস্থায়। তখন হবে কি ?

—যানের সঙ্গে একটা ইলাস্টিক দড়ি নিয়ে নিজেকে আটকে রাখতে হবে।

অমর যেন কাকামণিকে নিরুত্তর করে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। জিজ্ঞাসা করলে—কিসের দড়ি ?

—নাইলনের দড়ি—বৈজ্ঞানিকরা আগেই ভেবেছেন।

—ঝুলবে তো ?

—টান হয়ে ঝুলবে না। পায়ের তলায় মাটির টান আছে কি ? সাঁতার কাটার মতো ভাসবে।

—নড়াচড়া করবে কী করে ? এদিক-ওদিক যাবে কী করে ?

—সে এক মজার ব্যাপার! সঙ্গে একটা ভারী জিনিস (এ জায়গায় অবশ্য 'ভার' বলে কিছু নেই) ব'য়ে নিয়ে যাবে। এটা খুব সরু একটা নাইলন দড়ির সঙ্গে আট্‌কানো থাকবে। এটাকে একদিকে ধাক্কা দিয়ে উলটো দিকে সরে যাবে। ছোট্ট পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ে ছুঁড়েও এদিকে ওদিকে নড়াচড়া করতে পারে। যে দিকে গুলি ছুঁড়বে তার উলটো দিকে সরে যাবে।

সুমিত্রা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করলে, ঘরের মধ্যে চেয়ার টেবিল এসব থাকবে তো ?

অমরও জিজ্ঞাসায় যোগ দিলে। বললে, ছুরি, কাঁচি, হাতুড়ি, এসব ?

বরেন হেসে বললে, ব্যবহার করা মুশকিল। সব জিনিস দেওয়ালের সঙ্গে আটকে রেখে দিতে হবে। ভার আছে কি যে ঠেকে থাকবে ? মনে কর, তাকের ওপর জলের বোতল। তাকের ওপর এমনিতে থাকবে না। আটকে রেখে দিতে হবে তাকের সঙ্গে।*

—বোতল থেকে জল ঢাললে কী হবে ?

*পরিশিষ্ট দেখুন

—ফুটবলের মতো জলটা জমে গোল হয়ে যাবে।

—গোল হয়ে যাবে কেন?

—জলের অণুগুলোর মধ্যে যে পরস্পর আকর্ষণ রয়েছে তারই ফলে।

ঠাকুমা বললেন, তাহলে রান্নাবান্না কী করে হবে?

অমর হেসে বললে, ঠাকুমার যা চিরকালের ভাবনা! রান্না আর খাওয়া!

—রান্না করতে গেলে রান্নার জায়গাটার ভিতরে জিনিস রেখে জায়গাটাকে ঘূর্ণিযন্ত্রে ঘোরাতে হবে। তা না করলে ভিতরের জিনিস তো পাত্রটার দেওয়ালেই ঠেক্‌বে না!

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, আগুন পাবে কোথায়?

—কেন? ইলেকট্রিক যন্ত্র থাকবে। বৈদ্যুতিক আর চৌম্বক শক্তির যন্ত্রপাতি ঠিক ঠিক কাজ করবে। ইলেকট্রিক হিটার ঠিক কাজ করবে।

ঠাকুমা আবার জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা, বরেন, দেশলাই জ্বলবে?

—জ্বলবে, তবে কাঠির মাথাটা দপ্‌ করে নিভে যাবে। শিখা উঠবে না, হাওয়া নেই বলে।

অমর প্রশ্ন করে, কিন্তু, কাকামণি, বিদ্যুৎ তৈরী হবে কী করে? বড় বড় ডায়নামো এত দূর ঠেলে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া তো খুব অসুবিধে। জ্বালানি লাগবে অনেক। তারও তো আবার অনেক অসুবিধে!

—অন্য সব ব্যবস্থা আছে।

—বল না, কাকামণি!

—সূর্যরশ্মি থেকে শক্তি সংগ্রহ করা যেতে পারে। সেই শক্তিকে বিদ্যুতে পরিণত করা যায়।

উপগ্রহটার উপরে বা পাশে কোথাও ইঞ্জিন বসানো হবে সূর্য থেকে তাপ নিয়ে জলকে বাষ্পে পরিণত করার জন্যে।

এর বয়লার সূর্যের তাপ নিয়ে গরম হয়ে উঠবে। এই বাষ্প থেকে বিদ্যুৎ তৈরী করা হবে। পরে এই পদ্ধতিটার আলোচনা করব। এখন থাক।

—এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই?

—অন্য উপায়ও আছে। 'সেমিকন্‌ডাকটর ব্যাটারী' দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী করা যেতে পারে।

—সে আবার কী?

—এমন কতকগুলো ধাতু আছে যাদের ওপর তাপ পড়লে সেই তাপ বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই সব ধাতু দিয়ে সেমিকন্‌ডাকটর ব্যাটারী তৈরী হয়।

—সেমিকন্‌ডাকটরের (semiconductor) মানে কি, কাকামণি?

—'সেমি' মানে অর্দ্ধেক, 'কনডাকটর' হোলো পরিবাহক। অর্থাৎ যে ধাতু বিদ্যুৎ প্রবাহকে পুরোপুরি বহনের সামর্থ্য রাখে না, কিছু কিছু বইতে পারে। পরে আর এক সময় এদের কথা বলবো। পুরো বলতে গেলে আরো একটা বিরাট কাহিনী বলতে হবে।

—আর কী কী ব্যবস্থা থাকতে পারে—বিদ্যুৎ তৈরীর জন্যে?

—আরো থাকতে পারে। আর এক ধরনের 'ব্যাটারী' ব্যবহার করা যেতে পারে। ইংরেজী নাম—

ঠাকুমা বাধা দেন, থাক বাবা, জেনে দরকার নেই।

—না, নামটা আমি জানবোই। অমর জোর ধরে।

বরেন হেসে বললে, বড্ড বড় নাম। "photoelectric semi-conductor battery"।

—ব্যাপারটা কী?

—ব্যাপারটা হোলো, আলো থেকে তাপ, তাপ থেকে বিদ্যুৎ—এই পরিবর্তন সাধন করার যন্ত্র।

সুমিত্রা সহসা বলে, দেখ্ছো, কাকামণি, আলোচনায় কোথা থেকে কোথায় এসে গেছি! মহাশূন্য ভ্রমণের বিপদ আলোচনা করছিলে তো ?

—হ্যাঁ, প্রথমে তো 'ভারহীনতার' বিপদের কথা বললাম! এরপর আছে উল্কার বাধা, 'কস্‌মিক্ রে' (মহাজাগতিক রশ্মি)!

—এসবগুলো থেকে আত্মরক্ষা করবো কেমন করে ?

ঠাকুমা বলেন, আগে বিপদগুলো কী তাই জানো!

অমর সুমিত্রার দিকে উদ্দেশ করে বললে, দাঁড়া, আগে খাড়া হয়ে দাঁড়াই—চলাফেরা করি, তারপর তো বিপদ এড়াবো! 'ভারহীন' অবস্থায় থাকলে তুই বিপদ এড়াবি কী ক'রে ? দাঁড়াবি কী করে ? ঘরের ভেতর জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখবি কেমন করে ? হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুক্‌বি কেমন করে ?

ঠাকুমা হেসে বললেন, এবার দেখ্‌লি তো অমর ভাই! তোর সেই হাতুড়ি পেরেকের ভাবনা! আমার যেমন রান্নার ভাবনা। সুমিত্রার যেমন খাট পালঙ্কের ভাবনা!

বরেন অমরকে লক্ষ্য করে বললে, ভার অবশ্য তৈরী করে নেওয়া যায়। যদি উপগ্রহটাকে লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এসব অসুবিধা ঘুচে যাবে।

ঠাকুমা বললেন, ঘুরিয়ে দিলেই হোলো ?

—হ্যাঁ, ঘুরিয়ে দিলেই নকল অভিকর্ষ তৈরী হ'য়ে যাবে!

—সব সময় ঘোরাতে হবে ?

—তা কেন ? একবার ঘুরিয়ে দিলে বহুদিন ধরে ঘুরবে। ঘুরতে থাকলে মনে হবে মাটির টান পড়ছে পেশীতে। পায়ের নীচে। যেন পৃথিবীর ওপরই কাজ করছি। তফাত এই মাত্র যে ভারটা কম মনে হবে, মানুষের দেহের ভারই বলো আর যন্ত্রপাতি জিনিসপত্তরেরই বলো।

—দেখ্‌লি বরেন, ভগবান সব উপায় করে রেখেছেন আগে থেকেই।

সুমিত্রা খিল খিল করে হেসে বললে, বাঃ বেশ ফন্দী তো প্রকৃতিকে জব্দ করবার? কে বের করলে কাকামণি?

—নকল উপগ্রহের বেলায় যে এটা করা সম্ভব, আর, করলে খুব উপকার পাওয়া যাবে তা আজ থেকে প্রায় পঁচানব্বুই বছর আগে রুশবিজ্ঞানী জিয়লকভস্কি লিখে গেছেন।

—লোকটার কী মাথা?

বরেন হাসতে হাসতে বললে, ভদ্রলোকের খুব লম্বা দাড়ি ছিল—আমাদের রবীন্দ্রনাথের মতো!

ঠাকুমা গম্ভীর হয়ে বললেন, ওসব মুনিঋষিদের দাড়ি তো থাকবেই!

ঠাকুমা ছাড়া সবাই হেসে উঠ্‌ল একসঙ্গে।

হাসির ঢেউটা পেরিয়ে গেল। সুমিত্রা তার পুরোনো প্রশ্ন আবার পাড়লে, অন্যান্য বিপদের কথা বললে না কাকামণি?

—বল্‌ছি। প্রথমে ধরো উল্কা।

—উল্কা আর কটাই বা পড়ে? ওটা কী একটা সমস্যা? আর কত বড়োই বা হতে পারে? বলে অমর।

—সমস্যাটা খুব ছোটো নয় অমর। প্রত্যেক বছর পৃথিবীর ওপর কয়েক হাজার উল্কা পড়ে। আর যদি খুব ছোটো ছোটো গুঁড়ি গুঁড়ি উল্কাগুলোকে ধরো তো এদের সংখ্যা অনেক। প্রতি সেকেণ্ডে এরকম গুঁড়ি গুঁড়ি উল্কা পড়ে দশ হাজার থেকে এক লক্ষটা। রুশদেশের বৈজ্ঞানিক বি, এম্‌, অরলভ আর বি, য়ু, লেভিন হিসেব করে দেখেছেন যে প্রতিদিন পৃথিবীর মাটির ওপর দশ থেকে পনেরো টন উল্কা পড়ছে!

—গুঁড়ি পড়লে কী হবে? ওতে কী এসে যাবে?

—বড় উল্কাও আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় কয়েক বছর আগে একটা ষাট টন উল্কা পড়েছিল।

অমর খুব চিন্তিত হয়ে বললে, তাহলে তো ভাবনার কথা। আচ্ছা কাকামণি, কী রকম বেগে যায় ওগুলো?

—তা নিতান্ত কম বেগে নয়। সেকেণ্ডে দু-মাইল, আড়াই মাইল, তার মানে ঘণ্টায় আট হাজার ন হাজার মাইল! অনেকের গতি আবার সেকেণ্ডে বিশ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় বাহাত্তর হাজার মাইলও হয়!

সুমিত্রা বলে ওঠে, ওরে বাবা! কী সাংঘাতিক! তাহলে কী হবে?

—ছোটো ছোটো উল্কার জন্যে ভাবনা নেই! একেবারেই যে নেই তা নয়! উপগ্রহের গায়ের পালিশ নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিছুদিন পরে, আর পালিশ কমে গেলে বেশী গরম হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া সামনের কেবিনের স্বচ্ছ কাঁচ ক্রমশঃ ঘোলাটে হয়ে আসবে!

এটাও সওয়া যায়। কিন্তু বড়গুলোর সঙ্গে লড়াই করাই শক্ত!

মাত্র 'একগ্রাম' ওজনের উল্কা যদি ঘণ্টায় বাহাত্তর হাজার মাইল গতি নিয়ে এসে উপগ্রহে ধাক্কা দেয়, তাহলে স্টীলের খোল থেকে বারো থেকে পঁচিশ পাউণ্ড ওজনের টুক্‌রো ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারে।

যদিও বড় উল্কার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম তবু তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে তৈরী হয়ে থাকাই ভালো। হিসেব করে দেখা গেছে মঙ্গল গ্রহ যাত্রায় যে ক'মাস সময় লাগবে তার মধ্যে একটা না একটা একগ্রামের কম ওজনের উল্কার সঙ্গে দেখা হবে!

তবে মুশকিল এই, কখন যে এই ছুটন্ত ধাতুপিণ্ডগুলোর কোন্‌টার সঙ্গে দেখা হবে তা আগে হিসেব করা যায় না। ভাগ্যে হয়ত একটা বড়োর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারে!

—তাহলে কি করা যাবে ? ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে সুমিত্রা।

—আগে থাকতে জানতে পারলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

—আগে থাকতে জানতে পারা যাবে কি করে ?

—আছে, যন্ত্র আছে যা দিয়ে জানা যেতে পারে।

—কি নাম ?

—'রাডার' বা 'বেতার সন্ধান যন্ত্র'।

—এটা দিয়ে কী হয় ?

—দূরের কোনো জিনিসের সন্ধানে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছুঁড়ে দেওয়া হয়, সেটা তার গায়ে ঠেকে আবার ফিরে আসে ; যেমন করে রবারের বল দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে! সময় আর তরঙ্গের গতি বিচার করে দূরত্ব ঠিক করে নেওয়া হয়। এই রাডার যন্ত্র দিয়ে বিমান ঘাঁটি থেকে বিমানের অবস্থিতি জানা যায়। এই 'রাডার' দিয়ে বড় উল্কার অবস্থান আগে জেনে নিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়, কিংবা মেশিন গান চালিয়ে তাকে আগে থাকতেই গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।

—অত জোরে যে জিনিস ছুটে আসছে, তাকে কি করে গুলি করা যায় ?

—যন্ত্র দিয়ে আগে থেকে দূরত্ব, বেগ, দিক নির্ণয় করে সময় মতো গুলি ছোঁড়া হবে। গোটা ব্যাপারটা আপনা থেকে ঘটে যাবে।

অমর গম্ভীর ভাবে বললে, অটোমেটিক !

বরেন হেসে বললে, তাই !

—যাক, উল্কাদের ব্যবস্থা তো হোলো ! এবার ঐ যে মারাত্মক রশ্মিগুলো—কি নাম যেন ?

অমর গম্ভীর হয়ে বললে, 'মহাজাগতিক রশ্মি'।

ঠাকুমা প্রশ্ন করেন, ব্যাপারটা কি রে বরেন ? একটু বুঝিয়ে বল তো। নাম জানলেই তো আর জিনিস জানা যায় না !

সুমিত্রা বলে, ঠাকুমাকে এড়ানো মুশকিল। জানো কাকামণি, এক ধরনের লোক আছে যারা নাম করেই খালাস। কী জিনিসটা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। ঠাকুমা কিন্তু অন্য রকমের।

বরেন হেসে বললে, তোমরাও ঠাকুমার উপযুক্ত নাতি-নাত্‌নী। তোমাদের হাত থেকেও তো নিস্তার নেই। দেখ না বোঝাতে বোঝাতে প্রায় মাঝরাত হয়ে গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ।

সুমিত্রা বলে, মহাকাশও তো এ রকম নিস্তব্ধ, কাকামণি!

—ভীষণ নিস্তব্ধ!

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, উপগ্রহের ভেতরের লোকেরা পরস্পরের কথা শোনে কি করে?

—ভেতরে হাওয়া তৈরী করতে হয়।

অমর ব'লে ওঠে, এই যাঃ! কাকামণি, দেখলে, এটা তো জানা হয় নি! সত্যি তো, হাওয়া চাই মানুষের জন্যে। এই আলোচনাটা হয়ে যাক, তারপর কিন্তু বলতে হবে, হাওয়া তৈরীর ব্যাপারটা।

—আচ্ছা, তাই হবে। এখন বলছি মারাত্মক রশ্মির কথা। জ্বলন্ত সূর্য থেকে বিপুল শক্তি মহাকাশের সবদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এই বিচ্ছুরিত রশ্মি বয়ে চলেছে দিকে দিকে, নানা দৈর্ঘ্যের অদৃশ্য ঢেউয়ের মাপে মাপে।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, শক্তির আবার ঢেউ কি?

—এ, সি (A.C) বিদ্যুতে হাত পড়লে মনে হয় না দেহের ভিতর দিয়ে যেন একটা ঢেউ বয়ে গেল?

—'এসি' বিদ্যুৎ কি?

—যে বিদ্যুৎ প্রবাহ একবার কমে আবার বাড়ে, আবার কমে আবার বাড়ে—এই ভাবে ব'য়ে যায় তাকে বলা হয় অল্‌টারনেটিং কারেন্ট, 'এসি'।

অঙ্কে এর যে ভাবে হিসেব করা হয় তাও ঢেউয়ের গতির হিসেব। তাই বললাম ঢেউ। আলো, রঙ, এসবও এম্‌নি শক্তির ঢেউ।

সূর্যের শাদা আলোর একটা কিরণ একটা তিনকানা কাঁচের (prism) ভিতর দিয়ে চালিয়ে দিলে তা সাতরঙে ভেঙে পর্দ্দার উপরে পড়ে। সাতরঙের এই সমাবেশটাকে বলে বর্ণালী—স্পেক্‌ট্রাম (spectrum)। এই সাতরঙের প্রত্যেক রঙের আলো এক একটা বিশেষ মাপের শক্তির ঢেউ। এই সাতরঙের একটা নির্দ্দিষ্ট পারম্পর্যও আছে, প্রথমে বেগুনী, তারপর ক্রমান্বয়ে গাঢ়নীল, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা (নারাঙ্গী) তারপর লাল।

এই রঙগুলো চোখে দেখা যায়। এই মাপের আলোর ঢেউগুলো আমাদের ইন্দ্রিয়ের (চোখের) আয়ত্তের মধ্যে। এদের মধ্যে বেগুনী আলোর ঢেউয়ের মাপ সবচেয়ে ছোটো, আর লাল আলোর ঢেউয়ের মাপ সবচেয়ে বড়ো। কিন্তু, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে—এমন অদৃশ্য শক্তিপ্রবাহ আছে যার ঢেউ বেগুনী আলোর ঢেউয়ের চেয়ে মাপে ছোটো, আবার এমন শক্তিপ্রবাহ আছে যার ঢেউয়ের মাপ লাল আলোর ঢেউয়ের চেয়ে মাপে বড়।

শাদা আলো তিনকানা কাঁচ দিয়ে ভাঙ্‌লে এই রঙ্‌গুলো নিজেদের পরপর—অর্থাৎ ছোটো ঢেউয়ের পর বড় ঢেউ, এই পর্যায়ে—সাজিয়ে একটা স্কেল তৈরী করে। এই স্কেলের ডানদিকে লাল, বাঁদিকে বেগুনী। লালের ডানদিক আর বেগুনীর বাঁদিক কিন্তু শূন্য নয়। বেগুনীর বাঁদিকের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে যাদের জন্যে, তাদের ঢেউয়ের মাপ বেগুনীর ঢেউয়ের মাপের চেয়ে ছোটো। তাই এদিকে বলা হয় বেগুনী উজানের আলো! লালের ডানদিকের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে যাদের জন্যে তাদের ঢেউয়ের মাপ লাল আলোর ঢেউয়ের মাপের চেয়ে বেশী। তাদিকে বলা হয় লালভাটার রঙ্‌। এই উজানী ঢেউগুলোকে ইংরেজীতে বলে ultra violet আর ভাটার ঢেউগুলোকে বলে infra red।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে, কোন্‌ ঢেউগুলো ক্ষতিকর?

—এই উজানের ঢেউগুলো!

—এই ঢেউগুলো কি পৃথিবীতে পৌঁছোয় না ?

—বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তর এই গুলোকে শুষে নেয়। যেমন ঢেউ ভেঙে যায় নদীর পাড়ে, তেমনি শক্তির এই ঢেউগুলি অক্সিজেন অণুগুলোর উপর প'ড়ে নিজেদের শক্তি এদের বিলিয়ে দেয়, যার ফলে তৈরী হয় নতুন একটি পদার্থ—

—নাম ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—ওজোন (ozone)!

—কী করে এই পরিবর্তনটা হয় ?

—এদের ধাক্কায় অক্সিজেন অণুগুলো ভেঙে ভেঙে পরমাণু হ'য়ে যায়। এই পরমাণু আবার নতুন অক্সিজেন অণুর সঙ্গে নিজেকে জুড়ে 'ওজোন' তৈরী করে!

—মাটি থেকে কত ওপরে এসব ঘটে ?

—দশ থেকে প্রায় তিরিশ মাইল উপরে।

—এর ওপরে বা নীচে ওজোন দেখা যায় না ?

—না। তাই থেকে বোঝা যায় যে বায়ুর এই স্তরে সূর্য শক্তির উজানী ঢেউগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

—কিন্তু উপগ্রহ যেখানে রয়েছে বা যত উচুঁতে চলেছে মহাকাশযান, সেখানে তো অক্সিজেন নেই।

—তাই তো অনেক বিজ্ঞানী বলেছেন খোলের যদি দুটো স্তর থাকে, আর সেই দুইস্তরের মাঝখানে যদি অক্সিজেন ভরা থাকে, তাহলে সমস্যাটার সমাধান হ'তে পারে।

—আর কী কী রশ্মি থাকতে পারে ? অমরের কৌতূহল বেড়ে যায়।

—এক্স্‌রে (X Ray) থাকতে পারে! সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত এক্স্‌রে গুলো ঠেকানো সোজা। যে সব জিনিস দিয়ে মহাকাশ জাহাজটি গড়া হয়, তাদের মধ্যেই এই রশ্মিগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

—কিন্তু কাকামণি, ঐযে 'মহাজাগতিক রশ্মি'—'কস্‌মিক্ রে'—তাদের থেকে আত্মরক্ষার উপায় কী ?

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, ওগুলো আবার কি ?

—এগুলোর বেশীর ভাগ পদার্থের মৌলিক অংশ। এক ধরনের অংশ আছে যার নাম 'প্রোটোন'। এরা হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রস্থ ভর বা বস্তু। আর এক ধরনের মৌলিক অংশ আছে যার নাম আল্‌ফা (Alpha) টুকরো। এটা হোলো হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রস্থ ভর বা বস্তু। দারুণ বেগ বস্তুর এই মৌলিক অংশগুলোর।

—কত বেগ ?

—আলোর গতিবেগের মতো গতিবেগ। সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইলের কাছাছাছি।

—কী পরিমাণে এইগুলো উপগ্রহের গায়ে এসে পড়ে ?

—বৈজ্ঞানিকরা হিসেব করে দেখেছেন প্রতি দশ মিনিটে দশ লক্ষেরও ওপর উপগ্রহের গায়ে প্রতি বর্গ মিটার জায়গায়।

—এগুলো আসে কোথা থেকে ?

—মহাশূন্য থেকে—মেপে বলা যায় না সঠিক কোথা থেকে।

ঠাকুমা বলেন, এগুলোই বুঝি সৃষ্টির আদি বস্তু ?

—তাইতো মনে হয়।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, তাহ'লে এগুলো এমন বিপজ্জনক কেন ?

—কতদূর বিপজ্জনক তা বলা যায় না। ইঁদুরের গায়ের চামড়ায় ক্ষতি হয়েছে দেখা গেছে। আবার এও দেখা গেছে যে মানুষের চামড়ায় কিছু হয় না। সুইজারল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক আইগ্‌ষ্টের (Eigster) একটুকরো সুরক্ষিত মানুষের চামড়াকে এই মহাজাগতিক রশ্মির আওতার মধ্যে এনে তাকে পরে মানুষের গায়ে কলমের মতো লাগিয়ে দিয়ে দেখেছেন যে তার বেঁচে থাকার ক্ষমতার কিছু হানি হয় নি।

—আচ্ছা, কাকামণি, মানুষের চোখে লাগলে কী হয় ?

—চোখের ভেতরের অংশ বিশেষের ক্ষতি হলেও দৃষ্টিশক্তির হানি হয় না। তবে বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন মহাশূন্যে এদের আওতার মধ্যে কয়েক মাসের বেশী থাকলে নাকি ক্ষতি হয়। এ বিষয়ে গবেষণায় এখনো শেষ কথা জানা যায় নি।

তবে এটা দেখা গেছে যে, এদের প্রতিরোধের শ্রেষ্ঠ উপায় হাইড্রোজেন, আর হাইড্রোজেন ধারণ করে এমন পদার্থ, যেমন জল, হাইড্রোকার্বণ ইত্যাদি পদার্থ।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, হাইড্রোকার্বণ কী রে?

—জীবিত বস্তুর উপাদান।

—দেখলি তো বরেন, জল আর জীবনের মূল পদার্থ এরা তুটোই এমন পবিত্র যে, যে কোনো বিষ এ-তুটো হজম করতে পারে। নীলকণ্ঠ যদি থাকেন তো, তিনি আছেন জলে আর জীবিত পদার্থে।

—আমি কিন্তু আজ একটা নতুন খবর পড়েছি, কাকামণি, এই বিষয়ে। বলে সুমিত্রা।

বরেন হেসে বললে, আমিও পড়েছি, ১৯৬০ এর বাইশে এপ্রিল তারিখে মস্কোর মহাকাশ বিজ্ঞানীরা খবর দিয়েছেন যে, তাঁরা বায়ুমণ্ডলের এই বিপজ্জনক স্তরের মধ্যে একটা সুড়ঙ্গ দেখতে পেয়েছেন। ভবিষ্যতে গ্রহান্তর যাত্রার সময় মহাকাশযানগুলি এই সুড়ঙ্গ ব্যবহার করবে।

—এই বৈজ্ঞানিকদের নামগুলো যেন কি কাকামণি?

—আলেকজাণ্ডার পুশকভ, শাশা দলজিনভ আর নিকোলাই পুশকভ।

ঠাকুমা বলেন, নামগুলো মনে রাখা বড় শক্ত।

—ওরা খুব শক্ত শক্ত সমস্যা সমাধান করছে তো। হোক শক্ত নাম। আমরা ঐ শক্ত নামই মনে রাখব। বলে অমর।

ঠাকুমা হেসে বললেন, আমি ভাই বুড়ো হয়েছি। আমার স্মৃতিশক্তির জোর গেছে কমে। তোরা মনে রাখিস।

॥ ছয় ॥

এতগুলো বিপদ কাটিয়ে অমর যেন আশ্বস্ত হোলো। সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, কাকামণি, এই নকল উপগ্রহগুলোর চেহারা কেমন? ঠাকুমা একদিন গল্পচ্ছলে বলেছিলেন বিশ্বামিত্রের নকল ব্রহ্মাণ্ড চেহারায় নারকেলের মতো ছিল।

অমর ধমক দিয়ে উঠ্‌ল, যাতা বলিস না সুমি!

সুমিত্রা অভিমানভরে বললে, তাহলে তুইই বল্ না দেখতে কেমন?

অমর বললে, আমি ছবিতে দেখেছি এক্কেবারে গোল। গায়ে চারটে শুঁড়ের মতন জিনিস।

বরেন বললে, তুমি যা দেখেছো অমর, তা প্রথম সোবিয়েত স্পুৎনিকের ছবি। আসলে ওটাই ছোঁড়া হয় নি। যে রকেটটা ছোঁড়া হয়ে ছিল তার শেষ পর্যায় থেকে ওটা খসে উপগ্রহে পরিণত হয়েছিল।

—আকাশে সূর্য চন্দ্র তারা গ্রহ উপগ্রহ যখন সবই গোল তখন নকল উপগ্রহগুলোও তো গোল হবে?

—মোটর বা এরোপ্লেনের মত মসৃন গা তো হতে পারে? সুমিত্রা বলে।

—তার কোনো মানে নেই। হাওয়ার বাধা নেই তো, যে মোটর গাড়ী বা এরোপ্লেনের মতো মসৃন-গা একটা লম্বা খোলের আকার হতে হবে?

তাছাড়া, পৃথিবী বা চাঁদের মতো গোল ঘনবস্তু হবে তারও মানে নেই। অন্যান্য প্রাকৃতিক উপগ্রহের মতো তো আকর্ষণ থাকবে না তার—! এতো ছোটো আকার, এতো অল্পবস্তু, যে সামান্য অভিকর্ষের উদ্ভব হবে তা প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই

নয়। তাই হাওয়া তৈরী করে একে মুড়ে রাখাও যাবে না। হাওয়াকে যে টেনে গায়ে পরে থাকবে সেটুকু আকর্ষণও নেই তার।

—তবু মানুষ থাকলে, তার তো ব্যবস্থা চাই।

—হ্যাঁ, তার ব্যবস্থা করা হবে।

ঠাকুমা বলেন, আমি কিন্তু স্পুৎনিকের গড়নটাই জানি না, বরেন! আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও না।

—প্রথম স্পুৎনিক ছোঁড়ার সময় সেটা রকেটের শেষ পর্যায়ে একটা মোচার মুখের মতো সুচোলো ঢাকনার মধ্যে ছিল। শেষে ঢাকনাটা খসে যায়, আর ওটা ঢাকা থেকে বেরিয়ে উপগ্রহে পরিণত হয়ে যায়।

—দ্বিতীয় স্পুৎনিকটা? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—দ্বিতীয় স্পুৎনিকটা কিন্তু রকেটের শেষ পর্যায়টাই। যা কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তা এই অংশটার মধ্যেই আছে। এটা একটা শূন্যে ভ্রাম্যমাণ ছোটো খাটো ল্যাবরেটরী।

—এতে কী কী যন্ত্র ছিল, কাকামণি?

—এর মাথায় ছিল বেগুনি উজানের অদৃশ্য শক্তিরশ্মি আর এক্স্‌রে (X'Ray) পরীক্ষার যন্ত্র। তার নীচেই ছিল রেডিও যোগে সংবাদ পাঠানোর যন্ত্র আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সব শেষে ছিল একটা ছোট্ট কেবিন, ভেতরে একটা কুকুর নিয়ে।

—স্পুৎনিক দুটো কী দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল, কাকামণি? লোহা না স্টীল?

—দুটো স্পুৎনিকই অ্যালুমিনিয়মের সঙ্গে অন্যধাতুর খাদ মিশিয়ে তৈরী হয়েছিল।

—মানুষ বাস করতে পারে, কাজ করতে পারে, এমন উপগ্রহ নিশ্চয়ই খুব বড় হবে, না, কাকামণি? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—হ্যাঁ, বড় হবে বইকি!

—চেহারায় কী রকম হবে, কাকামণি ?

—বৈজ্ঞানিকরা অনেক রকম ডিজাইন দিয়েছেন।

—কী কী রকম ?

—সব রকম ডিজাইন আলোচনার সময় নেই। একটা সহজ ডিজাইনের আলোচনা করছি। এতে সাধারণ গঠন প্রণালী আর গঠন বৈশিষ্ট্য সহজে বোঝা যাবে।

—কী রকম ডিজাইনটা ?

—একটা বিরাট ফাঁপা টিউবের চাকার মতো। এই ফাঁপার ভিতরে কর্মীরা বাস করবে, কাজকর্ম করবে।

বাইরের দেওয়ালে থাকবে রেলিং বা ধরবার জন্যে আংটা ধরনের জিনিস! পৃথিবী থেকে যে যানগুলো মালপত্র নিয়ে আসবে সেগুলোকে স্টীমার ঘাটে স্টীমারের মতো আটকে রেখে দেওয়া হবে এর সঙ্গে! ওপরের ডেকে কাজকর্ম করা চলবে!

—তুমি মহাকাশের স্টীমার ঘাট বা জাহাজ ঘাটের কথা বলছো, না, কাকামণি ?

—আকাশ-সমুদ্রের এই রকম একটা ঘাট তৈরী হবে প্রথম। মানুষ এখান থেকে গ্রহান্তর যাওয়ার যান তৈরী করবে।

—এটাও তো উপগ্রহ ?

—নিশ্চয়ই! এটাই প্রথম মহাকাশঘাট যেখানে মানুষ থামবে। এইটে তৈরী না হ'লে গ্রহান্তরে যাওয়া দুষ্কর হবে!

—কেন ?

—পরে সব কথাই বলবো।

—মানুষগুলো থাকবে কোথায় ?

—ভেতরে ফাঁপার মধ্যে—কেবিনে থাকবে। এখানে কর্মীরা বাস করবে!

—কেবিনে দরজা জানালা থাকবে তো ?

—নিশ্চয়ই। দরজাগুলো ভিতরের দিকে খুলবে আর আপনা

থেকেই বন্ধ হ'য়ে যাবে! ভেতরে যে সূক্ষ্ম আবহাওয়া তৈরী করা থাকবে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে, তার সামান্যতম চাপে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে! বাইরে যে চাপই নেই! ভেতরের সামান্যতম চাপে দরজা বন্ধ হ'য়ে আসবে। দরজার ফ্রেমগুলো হবে রবারের। নিশ্ছিদ্র হ'য়ে আটকে থাকার জন্যে!

—ভেতরে বা ওপরে মানুষের চলাফেরার কোনো অসুবিধে হবে না তো?

—আগেই বলেছি নকল উপগ্রহ বা মহাকাশস্টেশনে ভার থাকবে না। তাই 'ভার' তৈরীর জন্যে গোটা উপগ্রহটাকে সব সময় ঘোরাতে হবে। ঘুরবে নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে।

সবটাকে এই নকল ভার না দিয়ে যদি কাজ চলে তো সবটাকে ঘোরানো হবে না। যে অংশে কাজকর্মের সুবিধের জন্যে ভার তৈরী করতে হবে শুধু সেই অংশটাই ঘুরবে।

—এতো বড়ো জিনিস কী করে অতদূর আকাশে পাঠানো হবে? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—পৃথিবী থেকে পরপর রকেট পাঠিয়ে সেগুলো জুড়ে জুড়ে তৈরী হবে প্রথম অবস্থায়।

—জুড়বে কী দিয়ে?

—কেন? বিদ্যুৎ দিয়ে? বিদ্যুৎ দিয়ে ঝাল দেওয়া হবে। একটুক্‌রোর সঙ্গে আর একটুক্‌রো ঝাল দিয়ে জুড়ে দেওয়া হবে।

—বিদ্যুৎ তৈরীর ব্যবস্থা থাকবে?

—নিশ্চয়ই! একটা বিরাট আয়না তৈরী করা হবে সূর্যের আলোক একটা বিন্দুতে ধরে তাপ উৎপন্ন করার জন্যে। এই তাপ দিয়ে জলকে বাষ্প করা হবে। বয়লারটা থাকবে আয়নার তাপ সংগ্রহ কেন্দ্রে—অর্থাৎ যে বিন্দুতে আয়নার সব ঠাঁই থেকে প্রতিফলিত কিরণগুলো পরস্পরকে ছেদ করে।

—যে আয়নায় আমরা মুখ দেখি অম্‌নি, এক্কেবারে সমতল, আয়না ?

—না, মাঝখানে খালি।

—জল বাষ্প হোলো। তারপর ?

—সেই বয়লারে যে বাষ্প হবে সেই বাষ্পের চাপে টারবাইন ঘুরবে, তাতেই হবে বিদ্যুৎ। টারবাইন থেকে বেরিয়ে বাষ্পটা আয়নার পিছনে সূর্যের ছায়ায় একটা আধারে জমে যাবে।

ঠাকুমা অবাক হয়ে বলেন, একদিকে ফুটবে আর একদিকে জমে যাবে ?

—হ্যাঁ, মা, এই ছায়ার দিকের তাপ এতো কম যে আমাদের পৃথিবীর কোনো ল্যাবরেটরীতে এতো নীচু মাত্রার ঠাণ্ডা তৈরী করা খুব কঠিন কাজ।

—এই নীচুমাত্রাটা কতো ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—চার ডিগ্রী চরম নীচুমাত্রা। ইংরাজীতে চার ডিগ্রী অ্যাবসোল্যুট।

—চার ডিগ্রী, কী এমন অসম্ভব ঠাণ্ডা ? যা পৃথিবীতে তৈরী করা কঠিন ? বলে সুমিত্রা।

অমর বলে, যে সে চার ডিগ্রী নয়। অ্যাবসোল্যুট! আচ্ছা, কাকামণি, এর মানে কি ?

—যার নীচে আর ঠাণ্ডার মাত্রা নেই বিশ্বভুবনে, তার নাম চরমশূন্য—অ্যাবসোল্যুট শূন্য। আমাদের সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার যন্ত্রের যে মাত্রার হিসেব সেই মাত্রায় শূন্য সেন্টিগ্রেডের নীচে ২৭৩ মাত্রা। চার ডিগ্রী অ্যাবসোল্যুট মানে শূন্য সেন্টিগ্রেডের নীচে ২৬৯ ডিগ্রী।

—আচ্ছা, কাকামণি, জল ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে সূর্যের তাপ সংগ্রহ করা যায় না ?

—যায় বইকি। হয়তো তাতে বেশী সুবিধেই হবে। জল

তো শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের চেয়ে আর কম ঠাণ্ডা হয় না। তাই বৈজ্ঞানিকরা অন্যান্য জিনিসের কথাও ভেবেছেন।

সুমিত্রা বললে, কাকামণি, আর যে আয়না দিয়ে সূর্যের তাপ জড় করা হয় তা কী রকম দেখতে বুঝতে পারলাম না। অমর কেবল তার দিকে তোমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে!

ঠাকুমা হেসে বললেন, ও মেয়ে কিনা, আয়নায় ওর স্বাভাবিক ঝোঁক। ওই আয়নার কথাই বলো আগে।

অমর একটু বিরক্ত হয়ে বললে, আচ্ছা তাই বলো! ঐসব মেয়েলি প্রশ্নের জবাব দিতেই রাত কেটে যাক্।

—একটুখানি বলে নি অমর। এ প্রশ্নটাও তো ফেলে দেবার নয়। আসলে এই আয়নাটা প্রধান সরঞ্জাম যে! বলে বরেন।

—আয়নার মাঝখানটায় খাল বললে, কাকামণি! কিন্তু কী ধরনের খাল?

—আচ্ছা ধরো—খুব বড় একটা বালতিতে জল রয়েছে। সেই জলটাকে মাঝখানে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ খুব জোরে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে যেমন খাল হয় তেমনি।

—এ আয়নাটার কী নাম?

—পরপর বলছি। জলের তলে যে খালটা তৈরী হয়েছে সেটাকে কল্পনায় যে কোনো দিক থেকে দুটো সমান ভাগে কেটে ফেললে যে বাঁকা রেখাটা পাওয়া যাবে তার ইংরাজী নাম 'প্যারাবোলা' (parabola)।

—রেখাটির কী রকম চেহারা হবে?

—আচ্ছা আর একটা উদাহরণ দিয়ে আকারটা বোঝাতে চেষ্টা করবো।

মনে কর, মেঝে থেকে সমান উঁচুতে দুটো পেরেক পুঁতে রেখেছো। এই পেরেকদুটোতে একটা হাল্‌কা সূতোর দুদিক বেঁধে সেটাকে ঝুলিয়ে দাও। এমন সূতো যা টানলে বাড়ে না। দেখবে

সুতোটা একটা বিশেষ চেহারা নিয়ে ঝুলছে। অনেকটা সুমিত্রার স্কিপিং-এর দড়ির মতো। অর্থাৎ স্কিপিং করার সময় দড়ির যেমন আকার হয়। এই রেখাটাকে বলে প্যারাবোলা।

—আচ্ছা, কাকামণি, আয়নার ভিতর কী কাঁচ দিয়ে তৈরী? পিছনে অবশ্য পারা ঘসে দেওয়া থাকবে! জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—না। এই আয়নার টুকরোগুলো হবে হালকা ধাতুর পালিশ করা পাত। এগুলো পৃথিবীতে তৈরী হবে। রকেটযানে ক'রে এগুলোকে মহাকাশ স্টেশনে পাঠানো হবে, তারপর সেখানে সেগুলোকে জুড়ে নেওয়া হবে!

অমর জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা কাকামণি, এই আয়না ছাড়া বড় জিনিস কী থাকবে মহাকাশ ঘাটে?

—থাকবে রেডিও টেলিস্কোপ! রেডিও দূরবীণ! কয়েক হাজার বর্গমাইল জুড়ে ইলাষ্টিক তারের জাল!

—রেডিও দূরবীণ? সে আবার কী?

—এ এক ধরনের রেডিও তরঙ্গ ধরার যন্ত্র। বৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন মহাকাশের বিভিন্ন অংশ থেকে বিশেষ ধরনের শক্তিতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গগুলোর মাপ রেডিও তরঙ্গের কাছাকাছি! আলোক তরঙ্গের চেয়ে বহুগুণ বেশী। আলোক তরঙ্গের বদলে এই তরঙ্গ দিয়ে অলক্ষ্য জাগতিক বস্তুর স্থান আর প্রকৃতি বিচার করা হয়! শক্তির সব তরঙ্গ তো আলোর আকারে আসে না!

—এত ওপরে এ যন্ত্র বসানোর মানে কি?

—সেখানে হাওয়া নেই, আকাশে মেঘ নেই, আকাশে দুর্যোগ নেই। শক্তিশালী এই বিশেষ ধরনের দূরবীণ দিয়ে বৈজ্ঞানিকরা অনন্তের বহুদূর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন!

—আর কী কী থাকতে পারে এই মহাকাশের জাহাজঘাটায়? এই উপগ্রহ স্টেশনে? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—আর যেটা থাকতে পারে সেটাই সবচেয়ে অদ্ভুত!

—কী সেটা ?

—সবজি বাগান !

ঠাকুমা অবাক হ'য়ে যান, সে কী রে ? চাষ হবে শূন্যে ?

—হ্যাঁ মা, এম্‌নিই তো পরিকল্পনা করেছেন বৈজ্ঞানিকরা !

—ওমা, সেকি ! একী অসম্ভব কাণ্ড ! আচ্ছা। কী করে তৈরী হবে ?

অমর বলে, পৃথিবীর আশ্চর্য ব্যাবিলনের শূন্যের বাগানকে হার মানিয়ে দিলে যে ! ওটা তো শূন্যে নেই ; ওটা আছে একটা কাঠামোর ওপর। আর এটা ? এক্কেবারে শূন্যে যেখানে জ়ল নেই, হাওয়া নেই।

—কিন্তু আলো আছে। আর মানুষের হাতে আছে রাসায়নিক পদার্থ ! বলে বরেন।

—কী ক'রে তৈরী হবে, কাকামণি ?

বরেন নিজেই উৎসাহিত হ'য়ে গড় গড় করে বলতে শুরু করল।

—তলাটা তৈরী হবে রকেটের ভাঙা খোল দিয়ে। ওপরে থাকবে আড়াআড়ি ২৫০ গজ চওড়া স্বচ্ছ প্ল্যাষ্টিকের ছাদ। ওপরের প্ল্যাষ্টিকের ছাদটা নীচের সঙ্গে ফাঁপা ধাতুর খুঁটি দিয়ে আটকানো থাকবে !

তৈরী হয়ে গেলে, এখানে যা সবজি ফলবে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক জল্পনা কল্পনা হ'য়েছে। নতুন অবস্থায় গাছপালার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে হয়ত ! হয়ত এমন ফল তৈরী হবে যার আকার আর গুণ আজ পৃথিবীর চাষীরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

—সত্যিই, আশ্চর্য পরিকল্পনা ! অবাক হ'য়ে বলে সুমিত্রা।

বরেন উৎসাহিত হয়ে বলে চলল, এতে শুধু সবজি তৈরী হবে তাই নয়। আরও একটা বড় উদ্দেশ্য সাধিত হবে। মানুষের নিঃশ্বাসে সে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকবে সেটাকে শুষে নিয়ে এই সবজিগুলো টাটকা অক্সিজেন তৈরী করে দেবে।

—আচ্ছা ঐ যে মহাজাগতিজ রশ্মিগুলো, ঐ যে বেগুনী উজানের আলোকরশ্মি, তারা নষ্ট করে দেবে না সবজিগুলোকে?

—তার ব্যবস্থা অবশ্য রাখতে হবে, সূর্যের আলোকে ছেঁকে নিতে হবে সবজিতে পড়বার আগে। আমি শুধু সবজিদেরকে খাওয়ার ব্যাপারটা বলছি নে। এই ব্যাপারটা ছেড়ে দিলেও এই অক্সিজেন তৈরীর কৌশলটা খুব কাজে আসবে মানুষের।

একরকম সামুদ্রিক শ্যাওলা (algae) জানা গেছে, যা সূর্যালোকে নিজেদের মাপের পঞ্চাশগুণ অক্সিজেন তৈরী করে প্রত্যেক ঘণ্টায়। এগুলো খুব সূক্ষ্ম, অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়।

—কী নাম? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—হ্যাঁ, তোমাকে তো নামটা বলতেই হবে। নাম হোলো ক্লোরেল্লা (chlorella)।

সুমিত্রা প্রশ্ন করে, সবজি তৈরী হবে কিসের ওপর—একেবারে ধাতুর ওপর? না, মাটি ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে?

বরেন বলে, তারও সমাধান হ'তে চলেছে। একটা রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হ'য়েছে যার ওপর সবজির চাষ করা যায় বিনা মাটিতে।

—নাম? অমর জিজ্ঞাসা করে।

—নাম? এডেনোসিন ট্রাইফস্‌ফেট (adenosine triphosphate)!

তাছাড়া একবার জন্মালে আর ভাবনা কি? একবার জন্মে মরে গেলে যা পড়ে থাকবে তার ওপরই তো হতে পারবে নতুন চাষ!

—আচ্ছা কাকামণি, তার মানে এই স্টেশন আর পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগের জন্যে যানের ব্যবস্থা করতে হবে তো?

—নিশ্চয়ই। এক ধরনের শাটল্ রকেট। কিংবা শূন্যগামী ট্রেন বলতেও পারো। নিয়মিত যাতায়াত করবে পৃথিবী আর উপগ্রহ স্টেশনের মধ্যে।

—কী ধরনের হবে এই ট্রেন ?

—ভি-২ রকেটের অন্যতম আবিষ্কর্তা ভের্ন্হের ফন ব্রাউন (Wernher von Braun) একটা তিন পর্যায়ের রকেটের প্রস্তাব করেছেন যার সাহায্যে মহাকাশ স্টেশন তৈরীর মালপত্র পাঠানো হবে।

—কত বড় হবে ?

—খাড়া হ'য়ে দাঁড়ালে উঁচু হবে দুইশত সত্তর ফুট। ধরো, একটা বিশতলা বাড়ির মতো।

তলাটা চওড়া হবে সত্তর ফুট। আর ওজন ? ওজন হবে ছয় হাজার চারশ' টন। তার মানে প্রায় একটা জাহাজের মতো ! এটাকে মহাকাশের জাহাজ বলতে পারো।

—আচ্ছা, জ্বালানি কী হবে ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—ব্রাউন বলেছেন জ্বালানী হবে নাইট্রিক অ্যাসিড আর হাইড্রাজিন। হাইড্রাজিন দহনের কাজ করবে। যে কাজ অক্সিজেন করে। এই দু'ধরনের জ্বালানি পাম্প দিয়ে জ্বলন কক্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

—অন্যসব রাসায়নিক থাকতে হাইড্রাজিন (Hydrazine) কেন ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—দাহক বস্তু যত জানা গেছে সব চেয়ে শক্তিশালী এই হাইড্রাজিন।

—পাম্প চলবে কীসে ?

—হাইড্রোজেন পার অক্সাইড দিয়ে।

ঠাকুমা বলেন, আচ্ছা বরেন, ঐ জিনিসটা একবার আমার কানে দেওয়া হয়েছিল—কানের ভেতর কী একটা ফোঁড়ার মতো হয়েছিল—সেটাকে পরিষ্কার জন্যে !

—হ্যাঁ মা সেই বস্তুই !

—অবাক কাণ্ড ! একই বস্তুর কত রকম ব্যবহার !

অমর বলে, এবার জাহাজটার একটু বর্ণনা দাও না, কাকামণি ?

—তাই বলছি, এবার !

সব নীচের পর্যায়ে উনচল্লিশটা মূল মোটর আছে, আর বারোটা আছে ষ্টীয়ারিং-এর কাজের জন্যে। এই মোটরগুলোর মোট উর্দ্ধ চাপ বারো হাজার আটশ' টনেরও বেশী।

ছাড়ার পর ৮৪ সেকেণ্ডে, তার মানে প্রায় দেড় মিনিটের মধ্যেই, চার হাজার আটশ টন জ্বালানি পুড়ে যাবে। তার মানে রকেটের মোট ওজনের তিন চতুর্থাংশই পুড়ে যাবে। এই প্রথম পর্যায়টা খালি হয়ে গেলে প্যারাস্থট দিয়ে নেমে আসবে নীচে। এটা খসে গেলে দ্বিতীয় পর্যায়টা কাজ করতে শুরু করবে।

—দ্বিতীয় পর্যায়টার ক'টা মোটর থাকে ?

—২২টা মূল আর ১২টা ষ্টিয়ারিং-এর জন্যে। এই দ্বিতীয় পর্যায়টা খালি হয়ে এলে এটাও প্যারাস্থট নিয়ে নেমে আসে। এই পর্যায় দুটো নষ্ট হবে না। এগুলোকে বার বার ব্যবহার করা চলবে।

—তৃতীয় বা শেষ পর্যায়টায় কী থাকে ?

—তৃতীয় পর্যায়ে থাকবে তরল জ্বালানিওলা পাঁচটা রকেট। এর নাকের ভেতর থাকবে যাত্রী, মালপত্র, যন্ত্রপাতি, এই সব। দুটো পিছন থেকে হেলানো, মাছের পাখনার মতো ডানা থাকবে। ডানাগুলোর সঙ্গে থাকবে অন্যান্য যন্ত্রপাতি এটার ভারসাম্য বজায় করার জন্যে।

—এছাড়া অন্য প্রস্তাব নেই ?

—আছে বইকি। আমি একটার মোটামুটি বিবরণ দিলাম !

সুমিত্রা সহসা বললে, সেদিন আমার ক্লাসের মেয়ে, মৃন্ময়ী বলছিল, শূন্য তো শূন্যই ! কেন বাপু, বেশ তো আছো পৃথিবীতে, শূন্যে গিয়ে কী হবে ? ক'লকাতার বাড়ি ছেড়ে মধুপুর গেলে আমার মন কেমন করে ! শূন্যে গেলে তো কথাই নেই। পৃথিবীর জন্যে মন কেমন ক'রে কেঁদেই মরব !

বরেন হেসে বললে, মধুপুর থেকে কলকাতা তো চোখে দেখা যায় না! কিন্তু এই শূন্যের ছোট্ট শহর থেকে পৃথিবীকে স্পষ্ট দেখা যাবে!

সুমিত্রা হেসে বললে, ওরে বাবা! তাহ'লে মেয়েটা তো রাতদিন কাঁদবে! আচ্ছা, কাকামণি, এই শূন্যের উপগ্রহ থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখাবে? কেমন দেখাবে চন্দ্রকে? অন্য সব গ্রহ তারকাদের?

—এই আলোচনাটা শেষ হলেই সেই কথাটাই বলবো। সেও এক মজার কাহিনী।

হ্যাঁ, এখন তোমার মৃন্ময়ীর কথাটার উত্তর দিই। প্রথমে বলি, শূন্য অবশ্য শূন্য নয়। খুব পাতলা হয়ে ছড়িয়ে আছে গ্যাস আর চূর্ণ চূর্ণ বস্তু। সারা শূন্য ভরে আছে। বৈজ্ঞানিকরা এই গ্যাস আর চূর্ণ চূর্ণ বস্তুর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন। শূন্যে উঠ্‌লে জগতের অনেক রহস্য মীমাংসার উপায় তাঁরা খুঁজে পাবেন।

কস্‌মিক রে—মহাজাগতিক রশ্মি আছে, সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত বহু রকম অদৃশ্য রশ্মি আছে। মাটির ওপর এই সব অদৃশ্য রশ্মি পরীক্ষা করার অনেক অসুবিধা। পৃথিবীর বায়ুস্তর চুয়ে চুয়ে এঁকে বেঁকে, নষ্ট হয়ে, রূপ বদলে এদের পৃথিবীতে পেঁছুতে হয়। সৃষ্টির মৌলিক বস্তুকণার পরীক্ষা করার এত বড় সুবিধে আর কোথায় পাবে?

তাছাড়া আছে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজের সুবিধে। ইন্‌জিনিয়রদেরও আছে অসাধারণ সুযোগ।

—ইঞ্জিনিয়রদের সুযোগ কী সে? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—সব চেয়ে নীচু শৈত্যাঙ্ক যা তাঁরা ল্যাবরেটরীতে তৈরী করতে পেরেছেন তা পেরেছেন হিলিয়ম আর হাইড্রোজেনকে তরল করে—তার চেয়ে নীচের হিমমাত্রা সৃষ্টি করা খুব কঠিন

কাজ। চরম শৈত্যাঙ্কর চেয়ে কয়েক ডিগ্রী বেশী পর্যন্ত তাঁরা পেঁাছতে পেরেছেন মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। এই দারুণ হিমে বস্তুর বা ধাতুর কী ব্যবহার তা তাঁরা সঠিক জানতে পারছেন না। কিন্তু এই মহাশূন্যে এমন একটা বিরাট ল্যাবরেটরী যেখানে সাধারণ তাপমাত্রাই চরম শৈত্যাঙ্কের ওপর মাত্র চার ডিগ্রী। মহাশূন্যে সূর্যকে আড়াল করে দিলেই এই হিমাঙ্কে পেঁাছানো যায়।

—আচ্ছা, কাকামণি এ তো গেল চরম শৈত্যাঙ্কের সমস্যা। আচ্ছা খুব বেশী তাপমাত্রা তৈরী করবে কী করে?

—খুব সোজা। একটা মাঝখানে খাল 'কনকেভ' কাঁচের লেন্স দিয়ে সূর্য রশ্মি ধরলে হাজার ডিগ্রী তাপ পাওয়া যায়।

একদিকে ভীষণ তাপ আর একদিকে ভীষণ শৈত্য—এ-দুটো পাশাপাশি পেলে কত যে গবেষণার সুবিধে হবে তার ইয়ত্তা নেই। আরো সুবিধে ······

—আরো সুবিধে কী আছে?

—অনেক অনেক সুবিধে আছে—আর একটা উল্লেখ করবো। আর একটা সুবিধে হবে—গোটা আকাশমণ্ডলটা দেখতে পাওয়া যাবে।

সুমিত্রা বললে এবার, কাকামণি, বলো, এই উপগ্রহ স্টেশন থেকে চাঁদ পৃথিবীকে কেমন দেখাবে? মনে কর—আমরা সবাই ওখানে রয়েছি—কেমন দেখবো আমাদের এই পৃথিবীকে? সেখানেও কি দিনরাত্রি থাকবে, শীত গ্রীষ্ম থাকবে?

বরেন হেসে বললে, হ্যাঁ, দিনরাত্রি থাকবে। শীত গ্রীষ্ম থাকবে। তবে পৃথিবীতে যে কারণে দিনরাত্রি হয়, শীত গ্রীষ্ম হয়, সে কারণগুলোর ফলে কিন্তু ওখানের দিনরাত্রি শীত গ্রীষ্ম হয় না। হয় অন্য কারণে।

—বলো না, কাকামণি···

—বলছি। এখন ক'টা রাত অমর?

—তা প্রায় রাত্রি বারটা একটার মাঝামাঝি।

—আজকের রাতটা কত ঘণ্টা রে ?

অমর অবাক হয়ে বললে, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছ কেন, কাকামণি ? প্রায় তো বার ঘণ্টা।

—ওখানে রাত্রিটা বড় ছোটো রে।

—খুব ছোটো ?

—এই ধর আধ ঘণ্টার থেকে কয়েক মিনিট বেশী। ওখানকার রাত্রে বসে বড় গল্প বলা যাবে না।

ঠাকুমা বলেন, তার মানে ওখানকার লোকেরা ছোটো ছোটো বই পড়বে। খুব ছোটো গল্প লিখবে।

সুমিত্রা হেসে বললে, শেষ পর্যন্ত হয়তো ওখানে জাপানীদের মতো ছোট্ট কবিতার খুব চল হয়ে যাবে !

॥ সাত ॥

—এবার কাকামণি, মানুষের তৈরী উপগ্রহে দিনরাত্রি কেমন করে হবে বল ?

—আচ্ছা অমর, পৃথিবীতে দিনরাত্রি কেন হয় ?

—পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের চারদিকে যখন ঘোরে তখন যে দিকটা সূর্যের মুখোমুখি পড়ে সেই দিকটায় দিন আর অন্য দিকটায় হয় রাত্রি। আচ্ছা, কাকামণি, নকল উপগ্রহও তো এমনি ধারা ঘুরবে ?

—হ্যাঁ, ঘুরবে।

—তাতে দিন রাত্রি হবে না ?

—কতটুকু তার আয়তন ? এতটুকু জিনিস একবার ঘুরতে তার

সময়ইবা লাগবে কতটুকু ? তাছাড়া অতি অল্প সময়ের জন্যও যে অংশ সূর্যের আড়ালে থাকবে, সে অংশেও অন্যান্য উপগ্রহ বিচ্ছুরিত আলো পড়বে। এই প্রকার ঘোরার জন্যে দিনরাত্রির স্পষ্ট যে পার্থক্য, তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আসলে এর দিনরাত্রি হবে, অন্য কারণে।

—তবে, কী করে হবে ?

—নকল উপগ্রহের দিনরাত্রি নির্ভর করবে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরার ওপর। কোনো কোনো নকল উপগ্রহ দিনে ষোলবার পর্যন্ত পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে পারে। তাই পৃথিবীর একদিনের মধ্যে অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার ষোলবার দিন হবে আর ষোলবার রাত্রি হবে।

—রাত্রি হবে কখন ?

—যখন সূর্য পৃথিবী দিয়ে আড়াল হয়ে যাবে উপগ্রহ থেকে। পৃথিবীটা যখন সূর্য আর উপগ্রহের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে। এই সময় উপগ্রহটি পৃথিবীর ছায়ার ভিতর প্রবেশ করবে। এই ছায়ার অংশটুকু অবশ্য তার মোট গতিপথের অংশ মাত্র। এই ছায়ার মধ্যে উপগ্রহের রাত্রি আর ছায়ার বাইরে দিন। ছবি আঁকলে বুঝিতে পারা যায় উপগ্রহের রাত্রি সব সময়ই তার দিনের চেয়ে ছোটো। ধরো যে উপগ্রহটি পৃথিবীর চারদিকে চব্বিশ ঘণ্টায় ষোলবার ঘোরে তার দিনের দৈর্ঘ্য এক ঘণ্টা উনত্রিশ মিনিট আর তার সবচেয়ে দীর্ঘরাত্রি—শীতের রাত্রি, হবে ১৩৭ মিনিট।

ঠাকুমা বলেন, পৃথিবীর ছায়া ? আমি ঠিক বুঝতে পারলেম না, বরেন। মাটি কোথায় যে ছায়া পড়বে ?

—ছায়া বলতে বোঝায়—আকাশের যে অংশটুকু সূর্যের আলো থেকে আড়াল হয়ে যায়। পৃথিবীতে বাধা পেয়ে আকাশের যে অংশে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না, সেই অংশটাই পৃথিবীর ছায়া।

—কী রকম আকার এই ছায়াটার ?

—আকাশের এই যে অংশে সূর্যের কোনো কিরণ প্রবেশ করে না পৃথিবীর বাধার দরুণ, সেই অংশটা আকারে একটা বিরাট ফানেলের মতো—ফানেলের বড় মুখটাতে পৃথিবীর অর্দ্ধেকটা যেন বসানো—ছোট মুখটা সরু হয়ে একটা বিন্দুতে শেষ হয়েছে—এই কল্পিত ফানেলটায় একেবারে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না।

সূর্য পৃথিবীর বাঁদিকে থাকলে এই অন্ধকার ফানেলটা পৃথিবীর ডানদিকে পড়বে আর সূর্য পৃথিবীর ডানদিকে থাকলে পড়বে বাঁদিকে।

—কতটা লম্বা হবে এই অন্ধকার শূন্যের ফানেলটা?

—পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের ২১৭ গুণ। আর এই ফানেলের যে মুখটা সব চেয়ে বড় তার ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের সমান।

অমর জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, কাকামণি, পৃথিবী থেকে এমন দূরেও তো উপগ্রহটা থাকতে পারে যাতে তার রাত্রিই হয় না? অর্থাৎ এই ফানেল আকারের ছায়ার অঞ্চলটা এড়িয়ে যেতে পারে তো?

—নিশ্চয়ই। তখন সন্ধ্যা হতে পারে।

—সন্ধ্যাই বা হবে কেন?

—এই অন্ধকার ফানেলের ওপর নীচে যে আধোছায়ার অংশ তার মধ্যে দিয়ে তো যেতেই হবে! এই সময় কিন্তু সূর্যটা একেবারে আড়াল হয়ে যাবে না। পৃথিবীকে দেখা যাবে সূর্যের ওপর দিয়ে চলে যেতে।

—আচ্ছা এই দিনরাত্রি সব উপগ্রহের বেলায় কি এক?

—না, তা নয়, দিনরাত্রির দৈর্ঘ্যর পার্থক্য নির্ভর করে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উপগ্রহের দূরত্বের ওপর। ধরো এই দূরত্ব যখন ৩০০০ (তিন হাজার) মাইল তখন সবচেয়ে ছোটো দিন প্রায় দুই ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আর সবচেয়ে বড় রাত্রি আটত্রিশ মিনিট। ধরো, আবার, এই দূরত্ব যখন প্রায় চার হাজার চার

শো মাইল তখন সবচেয়ে ছোটো দিন প্রায় তিন ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট আর সবচেয়ে বড় রাত্রি চল্লিশ মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ড।

—আচ্ছা, কাকামণি, উপগ্রহে দিনের আগে ভোর বা রাত্রির আগে সন্ধ্যা হয় না? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—হয় বইকি!

—কখন হয়? কেন হয়?

—পৃথিবীর ছায়া থেকে সূর্যের আলোর ক্ষেত্রে ঢোকার আগে আধোছায়ার অংশের ভেতর দিয়ে তাকে কিছুক্ষণের জন্যে যেতে হয়। আবার আলো থেকে ছায়ায় ঢোকার আগে কয়েক মিনিট এই আধোছায়ার ভেতর দিয়ে পেরোতে হয়। এই দুটো সময় ভোর আর সন্ধ্যা।

—কিন্তু, কাকামণি, তুমি তো আগেই বলেছো—উপগ্রহ তো সব সময় পৃথিবীর চারদিকে গোলপথে ঘোরে না; আর, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তার দূরত্ব সমান থাকে না। কমে, বাড়ে। তখন কী হবে?

—এক্ষেত্রেও দিনরাত্রির তারতম্য হয়। গতিপথটা যত চ্যাপটা হয়, যত কম গোল হয়, রাত্রি তত দীর্ঘতর হয়।

—এই রকম গতিপথ হলে উপগ্রহ এক জায়গায় পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে আসে আর এক জায়গায় সবচেয়ে দূরে পড়ে যায়। তখন কী রকম হয়?

—দূরের জায়গায় রাত্রি বড় হয়েই থাকে।

—আচ্ছা, কাকামণি, দিনরাত্রির তারতম্য যদি হয়, তাহলে ঋতুভেদও তো আছে?

—আছে বইকি! তবে পৃথিবীর বেলায় যে কারণে ঋতুভেদ হয়, নকল উপগ্রহের বেলায় সে কারণে হয় না। নকল উপগ্রহের বেলায় ঋতু নির্দ্ধারণ করা হয়, তার গড় তাপমাত্রার ওপর। আর এই তাপমাত্রা নির্ভর করে সেই সময়ের ওপর, যে সময়টা এই উপগ্রহকে পৃথিবীর ছায়ায় কাটাতে হয়।

—তাহলে শীতকাল হবে কখন ?

—উপগ্রহে তখনই আসবে শীতকাল, যখন তার রাত্রিগুলো হবে সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী সময় তাকে পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে কাটাতে হবে।

—গ্রীষ্ম ?

—যখন তার দিনগুলো হবে সব চেয়ে বড়—অর্থাৎ সূর্যের আলোকে তার বেশী সময় কাটবে !

—আচ্ছা, আমাদের পৃথিবীর বেলায় যেমন উত্তর অংশের সঙ্গে দক্ষিণ অংশের তাপমাত্রার মিল নেই—এই নকল উপগ্রহের বেলায়ও কি সেই রকম হবে ?

—তা হবে না। এত ছোটো তার আকার যে তার দুই মেরুর মধ্যে তাপের কোনো তারতম্য হবে না। তাছাড়া এই উপগ্রহ যদি নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে ঘোরে, তাহলে তার সারা গায়ের সব জায়গাতেই একই তাপমাত্রা বজায় থাকবে।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা, বরেন, এত সব যখন থাকবে তখন এসব তার পঞ্জিকাতে থাকবে নিশ্চয় ?

সুমিত্রা ও অমর 'পঞ্জিকা' শুনে একত্রে হেসে উঠল।

বরেন বললে, তোরা হাসছিস কেন ? পঞ্জিকাও থাকবে।

সুমিত্রা ও অমর অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, সে কি ?

—তবে এই পঞ্জিকায় গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থিতি বিচার একটু ভিন্ন ভাবে হবে।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, কেন ?

—কেন না, উপগ্রহের যে গোলাকার বৃত্তপথ তা সব সময় প্রায়ই একটা তলেই থাকে আর এই তলটার সঙ্গে স্থির নক্ষত্রদের সব সময় একই প্রকার সম্পর্ক বজায় থাকে। যে উপগ্রহ, ধরো, বৃত্তাকার

পথে উত্তর মেরুর ওপর দিয়ে পৃথিবীকে পরিক্রমা করছে তার থাকবে দুটো গ্রীষ্ম, দুটো শীত।

হিসেব করে দেখা গেছে, জুন মাস ডিসেম্বর মাস তার পুরো ভরপুর গ্রীষ্ম, আর মার্চ মাস সেপ্টেম্বর মাস পুরো শীত, ভরপুর শীত।

মিলল কি আমাদের পঞ্জিকার সঙ্গে ?

—না।

—কিন্তু ধরো, এই বৃত্তাকার পথের তলটা যদি পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমা পথের তলের সঙ্গে একই সমতলে থাকে, তাহলে সারা বছরেও তার দিনরাত্রির দৈর্ঘ্য কমবেও না, বাড়বেও না। অর্থাৎ তার শীত গ্রীষ্ম কোনো ঋতুই থাকবে না।

—আচ্ছা, উপগ্রহের পরিক্রমার পথ যদি বৃত্তাকার না হয়ে চ্যাপটা বৃত্তের মতো হয়, তাহলে ?

—তাহলে তার দিন রাত্রির তারতম্য হবে।

—আচ্ছা, এক্ষেত্রে রাত বড় হবে, না দিন বড় হবে ?

—পরিক্রমার পথ যদি গোল না হ'য়ে চ্যাপটা হয়, তাহলে সাধারণতঃ রাত্রি গোলপথের রাত্রির চেয়ে বড় হবে।

—আচ্ছা, তখন রাত্রি কখন সবচেয়ে বড় হবে ?

—যখন উপবৃত্তের পথে উপগ্রহটা পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে থাকবে তখন রাত্রির যা দৈর্ঘ্য হবে তার চেয়ে বেশী দৈর্ঘ্য হবে সে যখন পৃথিবীর থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে !

—আচ্ছা, দিনের বা রাত্রির দৈর্ঘ্যের সবচেয়ে বেশী পার্থক্য কখন হয় ?

—যখন নকল উপগ্রহের কক্ষপথের তল পৃথিবীর কক্ষপথের সঙ্গে লম্ব ভাবে থাকে।

—একটা কথার আমি জবাব পাই নি এখনো, কাকামণি ?

—কী কথা রে ?

—নকল উপগ্রহ থেকে আকাশকে কেমন দেখবো? কেমন দেখবো গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রগুলোকে? আকাশের রঙ কী হবে?

—আগে রঙের কথাই বলি। রকেট যেই বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে উঠে গেল, অর্থাৎ ছাড়ার দু-এক মিনিট পর থেকেই আকাশের নীল রঙ ঘন কালো হ'য়ে এল। এ যে কী কালো তা আমরা পৃথিবীতে থেকে বুঝতে পারবো না। পৃথিবীর রাত্রিতেও বায়ুমণ্ডলে কিছু না কিছু আলোর রেশ থাকে ছড়িয়ে। কিন্তু মহাশূন্যে কোনো উপগ্রহের আড়ালে এলে অন্ধকারের চরম রূপের সঙ্গে দেখা হয়। বায়ু নেই ব'লে তারারা দপ্‌দপ্‌ করে না। আর এই অবস্থায় সূর্যের প্রখর আলোয় চোখ অনেক দিন অভ্যস্ত হলে তারা আর দেখতেই পাবে না।

—পৃথিবীকে কেমন দেখাবে?

—মনে হবে উপগ্রহের এক দিন-রাত্রির সময়ের মধ্যে পৃথিবী তাকে একবার ঘুরে এল।

—আমার তো খুব ভয় করবে।

—কেন?

—পৃথিবীটা নিশ্চয়ই খুব প্রকাণ্ড দেখাবে। আর এক প্রকাণ্ড গোলাকার পদার্থ মাথার উপর দিয়ে ঘুরবে। কেবল মনে হবে যদি ধাক্কা লেগে যায়, যদি মাথার ওপরে পড়ে!

—সব সময় অবশ্য দেখতে সমান বড়ো নাও থাকতে পারে।

—কেন?

—উপগ্রহের পরিক্রমার পথ যখন আকারে উপবৃত্ত, অর্থাৎ চ্যাপটাবৃত্ত, তখন পৃথিবীর আকার কমবে বাড়বে।

—আচ্ছা, সব সময় কি মনে হবে পৃথিবী একই বেগে চলেছে আকাশে?

—না, উপগ্রহের চলার পথ উপবৃত্ত হলে, কখনো মনে হবে

পৃথিবী তাড়াতাড়ি চলেছে, আবার কখনও মনে হবে ধীরে সুস্থে চলেছে।

—আর চাঁদ ?

—চাঁদের বেলায় একটু গোলোযোগ দেখা দেবে। পৃথিবীর বেলায় দেখবো পৃথিবী সোজা আকাশের এদিকে উঠে ওদিকে চলে যাচ্ছে। কিন্তু চাঁদের বেলায় অনেক ক্ষেত্রে অন্যরকম গতিপথ দেখা দিতে পারে।

একটা বিশেষ উদাহরণ দিই, শোনো। মনে কর, পৃথিবী-চন্দ্র যুক্ত করা রেখাটা নকল উপগ্রহের কক্ষতলের উপর লম্ব।

—যেমন গরুর গাড়ির চাকার লোহার বেড়টার সঙ্গে ধুরোর সম্পর্ক ? জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুমা।

—হ্যাঁ, যখন ঠিক এমন সম্পর্ক, তখন উপগ্রহের উপর দাঁড়িয়ে দেখলে দেখা যাবে চাঁদটা আকাশে একটা গোলাকার বা প্রায় গোলাকার পথে ঘুরছে।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

ট্রেনে চলতে চলতে অনেক সময় দেখবে দূরের এক সারি গাছ গোলপথে ঘুরছে যেন একটা অদৃশ্য ঘূর্ণির পাক লেগেছে।

—এই পরিক্রমার পথের যে তল, তা যদি পৃথিবী-চন্দ্র রেখার সঙ্গে একটা কোণ করে থাকে, অর্থাৎ গরুর গাড়ির চাকার বেড়টা ধুরোর দিকে হেলে থাকলে যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থায় যদি ঘোরার পথটা আর পৃথিবী-চন্দ্র রেখাটা থাকতো, তাহলে কী হতো ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—তাহলে চাঁদটা একটা উপবৃত্তে ঘুরতো। এছাড়া আরও একটা মজার অবস্থা হতে পারে। চাঁদটা একটা সরল রেখায় ডান দিক থেকে বাঁদিক, আবার ঘুরে বাঁদিক থেকে ডান দিকে যেতে পারে। যেন ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলছে। ধরো, ডান দিক থেকে বাঁদিকে চলেছে—যত চলেছে তত আকার ছোট হয়ে আসছে—

তত মন্দগতি হচ্ছে তার। কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে আসছে বাঁদিক থেকে ডানদিকে। ধীরে ধীরে আকারে বড় হচ্ছে। এটা অবশ্য নির্ভর করে উপগ্রহের পরিক্রমার তল আর পৃথিবী চন্দ্র রেখার পরস্পরের একটা বিশেষ সম্পর্কের ওপর।

—কী ভুতুড়ে দৃশ্যই না হবে! বলে সুমিত্রা।

ঠাকুমা বলেন, আচ্ছা বরেন, এবার আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। শূন্যে উপগ্রহ তৈরী করলে, বিদ্যুৎ তৈরীর যন্ত্র বসালে, টেলিস্কোপ বসালে, সবজির চাষও আরম্ভ করে দিলে—তারপর হয়ত ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করলে। কিন্তু গোড়ার দিকে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে কী করে? চিঠি পাঠিয়ে উত্তর আসার জন্যে অপেক্ষা করবে? অন্য ব্যবস্থা থাকবে?

অমর বলে, কাগজে পড়েছি, নকল উপগ্রহ মুহূর্তে মুহূর্তে পৃথিবীতে খবর পাঠাচ্ছে। জানিয়ে দিচ্ছে মহাশূন্যের খবর। মাটি থেকেও যন্ত্র দিয়ে তার অবস্থান জানা যাচ্ছে—চোখের বাইরে হারিয়ে গেলেও। শুনেছি মাটি থেকেও চালনা করা যাবে।

—হ্যাঁ, চাঁদে যখন প্রথম যন্ত্রের গাড়ি নামবে মানুষ ছাড়াই, তখন তাকে এই মাটি থেকে হুকুম পাঠিয়ে চালানো হবে। স্বয়ংক্রিয় অর্থাৎ আপনা থেকে চলতে পারে, আপনা থেকে বিচার করতে পারে, এমন যন্ত্রই পাঠানো হবে।

—প্রথমে এই পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের কথাটাই বলো।

ঠাকুমা বললেন, দাঁড়া, একসঙ্গে অতটা শুনলে সব গুলিয়ে যাবে। একটু জিরিয়ে নিই। তুইও একটু জিরিয়ে নে বরেন।

—হ্যাঁ মা, এ বিজ্ঞানের এক বিস্ময়। আজকের রেডিও প্রয়োগবিদ্যা—রেডিও ইন্‌জিনিয়ারিং এমন এক পর্যায়ে এসেছে যখন মনুষ্যসৃষ্ট উপগ্রহ থেকে পৃথিবীতে এমন কি মহাশূন্যের পৃথক্ পৃথক্ যাত্রা মহাকাশযানের মধ্যেও যোগাযোগ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

এ বিষয়ে মানুষ এতদূর এগিয়েছে বলেই আজ মানুষ মহাশূন্যে পাড়ি দিতে পারছে।

সুমিত্রা বলে, অবাক হয়ে যাচ্ছি কাকামণি, এই একটা ব্যাপারকে সম্ভব করতে মানুষের কতদিকের কত জ্ঞান লেগেছে! যেন মানুষ তার সর্ববিষয়ের জ্ঞানকে একজায়গায় জড়ো ক'রে তবে মহাশূন্যে পাড়ি দিতে পেরেছে।

—ঠিকই! মহাকাশভ্রমণের মধ্যে আধুনিক মানুষের সমস্ত জ্ঞানের একত্র সমাবেশ দেখা যাবে। বিংশ শতাব্দী বা তার পরের শতাব্দী মহাকাশভ্রমণের যুগ বলে ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে।

—ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জটিল।

—হ্যাঁ, খুব জটিল, তাই একটু সরল করে বলছি। পরে অনেক জিনিস বুঝতে সুবিধে হবে।

॥ আট ॥

বরেন যেন কিছুক্ষণের জন্যে হাঁফ ছেড়ে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলে।

—মহাকাশ যাত্রার আগে মহাকাশের জরীপ করতে হবে। তার নানান বৈশিষ্ট্য আর বাধার খবর নিতে হবে অনেক আগে থেকেই। আজ মানুষ উপগ্রহের ওপর এই সব সংবাদ পাঠাবার যন্ত্র বসিয়ে আগে থেকে মহাকাশের অবস্থা জেনে নিচ্ছে। যেন যাবার আগে স্কাউট পাঠাচ্ছে। এই সংবাদ সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হলেই তবে মানুষ সশরীরে শূন্যে হাজির হতে পারবে।

—এটুকু জেনে আমার মন খুশী হচ্ছে না, কাকামণি! ঐ যন্ত্রগুলো কী? কী করে কাজ করে? এইসব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। বললে অমর।

বরেন হেসে বললে, জানি, তোমার কাছে নাম, ধাম, কার্যপ্রণালী, এইগুলোই বড় !

অমর গম্ভীর হয়ে বললে, আমি যে এককালে এই বিষয়েই পড়ব, কাকামণি ! তাই, আগে থেকে একটু একটু জেনে নিচ্ছি !

—নকল উপগ্রহে সংবাদ পাঠানোর যন্ত্র বসানো আছে। এই যন্ত্র থেকে সংবাদ আসছে। সেই সংবাদ পৃথিবীর যন্ত্রে গৃহীত হচ্ছে, আর, গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংবাদের অর্থ উদ্ধার করা হচ্ছে। এই যন্ত্রের ভাষাকে আমাদের পরিচিত ভাষায় অনুবাদ করে নেওয়া হচ্ছে !

—কী যন্ত্র ? কী তাদের ভাষা ?

—যন্ত্রগুলো সব বেতার যন্ত্র। ভাষা, বেতার ঢেউয়ের ভাষা !

—বেতার ঢেউ কী জিনিস কাকামণি ? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—আগেই তো বলেছি এগুলো বিদ্যুতের ঢেউ !

—ও, হ্যাঁ আগেই তো বলেছ !

—হ্যাঁ, বেতার সন্ধান বা রাডার (Radar) প্রসঙ্গে বলেছি !

—আচ্ছা, কাকামণি, 'রাডার' কথাটার মানে কি ?

—আসলে 'রাডার' কোনো কথা নয়। চারটে ইংরেজী কথার প্রথমাংশগুলো নিয়ে কথাটা তৈরী হয়েছে !

—কথাগুলো কী কী ? আর কেমন করে এই রাডার কথাটা তৈরী হোলো ?

—Radio Detection and Ranging। Radio কথার Ra (রা), Detection এর D (ডি), and কথার A (এ), আর Ranging এর R (আর)—এইগুলো মিলিয়ে দেখো Radar কথাটা পেয়ে যাবে।

—বাংলায় মানে কি ?

—মানে বেতারতরঙ্গ দিয়ে সন্ধান আর দূরত্ব পরিমাপ। বাংলায় সংক্ষেপ করলে 'বেতার সনমাপ'। জানি না আমার এই

সংক্ষিপ্ত বাংলা কথাটা কেউ গ্রহণ করবে কিনা! তবে বাংলায় এই ধরনের একটা কথা তৈরী করা যেতে পারে 'রাডার'-এর পরিবর্তে!

—এর কার্যপ্রণালী কি? আর একবার একটু বড় করে বল না, কাকামণি!

বরেন একটু আগে থেকেই শুরু করলে:

এটা দেখা গেছে যে বেশীর ভাগ বস্তু থেকে, যেমন ধরো পাহাড়-পর্বত, জলের ওপর জাহাজ, আকাশে এরোপ্লেন—এই সব থেকে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় যেমন করে আলো ঠিকরে পড়ে মসৃণ তল থেকে! দূরের বস্তু সন্ধান করার সময় একটা যন্ত্র থেকে বেতার ঢেউ ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঢেউ আলোর বেগে ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। তারপর সেই ঢেউ লক্ষ্যবস্তুর গায়ে ঠেকে প্রতিফলিত হয়। লক্ষ্যবস্তুর গায়ে ঠেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার চতুর্দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই প্রতিফলিত অদৃশ্য ঢেউগুলোর কিছু অংশ ফিরে আসে সেইখানে, যেখান থেকে মূল ঢেউগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই প্রতিফলিত ঢেউগুলোকে বলে 'প্রতিধ্বনি' (Echo)। মূল ঢেউটাকে বলতে পারো 'ধ্বনি'।

ঠাকুমা বল্লেন, পাহাড়ী জায়গায় পথ-হারিয়ে-যাওয়া কাউকে নাম ধরে ডাকলে সেই ডাক যেমন পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, তেমনি ব্যাপার, নারে, বরেন?

—হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো এই ফিরে আসা তরঙ্গের নামকরণ করা হয়েছে 'প্রতিধ্বনি'! প্রথম ঢেউ ছড়িয়ে দেবার মুহূর্ত থেকে প্রতিধ্বনি গ্রহণ পর্যন্ত সময়টা মেপে হিসেব করে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব ঠিক করা হয়। কেন না, বেতার ঢেউয়ের গতিবেগ সব সময় সর্বাবস্থায় সমান!

—কতো, কাকামণি? অমর জিজ্ঞাসা করে।

—সেকেণ্ডে তিরিশ লক্ষ মিটার বা এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার

মাইল! আলোর গতির সমান! মহাকাশে উপগ্রহ বা উপগ্রহ-যানকে এই নিয়মে সন্ধান করা হয়। এই কৌশল প্রয়োগ করে বড় বড় উল্কার গতিবিধি জানা হয়। এই পদ্ধতিতে কাছে-পিঠের বা দূরের প্রাকৃতিক গ্রহ-উপগ্রহের দূরত্বও জানা যায় উপগ্রহযান থেকে!

—এটা তো সন্ধানের কাজ! এখন বলো, সংবাদ পাঠানোর কাজ কী করে করা হয় নকল উপগ্রহ থেকে? ধ'রে বসে সুমিত্রা।

—এক্ষেত্রেও সংবাদ পাঠাবার জন্যে রেডিও-ঢেউ ব্যবহার করা হয়।

—যে রেডিও-ঢেউয়ে গান ভেসে আসে 'আকাশবাণী'র কেন্দ্র থেকে?

—হ্যাঁ, তবে একটু পার্থক্য আছে। এই ঢেউগুলোর মাপ আলাদা।

—রেডিও-ঢেউ কী করে মাপা হয়, কাকামণি?

—জলের ঢেউয়ের মাপ জানো?

—না। কেউ কী বুঝিয়ে দিয়েছে কোনোদিন?

—জলের ঢেউ বা এই রকম যে সব ঢেউ, তাদের মাপ ধরা হয় একটা ঢেউয়ের মাথা থেকে ঠিক পরের ঢেউটার মাথা পর্যন্ত দূরত্বটাকে। অন্য ভাবেও মাপা যায়—একটা ঢেউয়ের খাল থেকে পরবর্তী ঢেউয়ের খাল পর্যন্ত। সূক্ষ্ম হিসেবে বলতে হয় একটা খালের সবনীচের বিন্দুটা থেকে পরবর্তী খালের সবনীচের বিন্দুটা পর্যন্ত!

—রেডিও-ঢেউয়ের বেলায়ও কী তাই?

—রেডিও-ঢেউ চাক্ষুষ দেখা যায় না তাই তার চেহারা কী জানি না; তবে এইটুকু জানি যে বৈদ্যুতিক শক্তি বাড়ে কমে। বাড়তির মুখে চরমে পেঁাছে আবার কমতে আরম্ভ করে। কিংবা কম্‌তির মুখে চরমে পেঁাছে আবার বাড়তে শুরু করে। একটা চরম অবস্থা

থেকে পরবর্তী একই ধরনের চরম অবস্থা পর্যন্ত একটা ঢেউ। এটাকে সাইকেলও (cycle) বলা হয়।

—সকালে রেডিও প্রোগ্রাম শুরু হবার আগেই যে ঘোষণা শোনা যায় অমুক মিটারে অমুক কিলোসাইকেলে...কী যে সব বলে ছাই! সেই সাইকেল বুঝি?

—হ্যাঁ, সেই সাইকেল!

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে, কাকামণি!

—আচ্ছা, এখন আমাদের রেডিওসেটে যে ঢেউগুলো ধরা পড়ে সেই চেনা ঢেউগুলোকে নিয়ে বিচার আরম্ভ করা যাক, তাহলে অন্যান্য মাপের ঢেউগুলির গতিপ্রকৃতি বুঝতে পারা যাবে! ঐ যে অমুকমিটার তমুকমিটার শোন, ওটা হোলো ঢেউয়ের দৈর্ঘ্যের মাপ!

আর ঐ যে শোনো 'কিলো সাইকেল' ওটা হোলো তার স্পন্দনের মাপ।

—স্পন্দন? সে আবার কী?

—বাড়তে বাড়তে কমা, তারপর কম্‌তে কম্‌তে বাড়া এটাই স্পন্দন! সেকেণ্ডে কতবার 'ঢেউ' ওঠে তাই গুণে স্পন্দনের হার মাপা হয়। যেই শুনলে ১০ কিলো সাইকেল অমনি বুঝতে হবে এক সেকেণ্ডে দশহাজার 'সাইকেল' দেখা গেছে। অর্থাৎ শক্তিপ্রবাহ একসেকেণ্ডে দশহাজার বার কমেছে বা বেড়েছে—অর্থাৎ দশহাজারটা ঢেউ উঠেছে।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, নতুন ওজন 'কিলোগ্রামের' কিলো আর এই কিলো একই, না?

—হ্যাঁ মা, কিলো মানে হাজার। কথাটা—

—কথাটা কোন্ ভাষার?

—গ্রীক। আর একটা কথার ব্যবহার হয় তার নাম 'মেগা সাইকেল'—অর্থাৎ দশলক্ষ সাইকেল। মেগা মানে দশলক্ষ। বাংলায় নিযুত। ইংরেজীতে মিলিয়ন।

—আচ্ছা, কাকামণি, সাধারণ রেডিও ঢেউ আর উপগ্রহের যন্ত্র থেকে ছড়ানো সঙ্কেত এরা একই রকম ?

—তফাত আছে।

—আচ্ছা, কাকামণি, সাধারণ রেডিও স্টেশন বা বেতারকেন্দ্র থেকে যে ধরনের রেডিওঢেউ ছাড়া হয়, সেই রকম ঢেউ এক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় না কেন ?

—তার কারণ এই রকম সাধারণ রেডিও ঢেউ যেমনি বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তর ভেদ করে যেতে পারে না তেমনি বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে এই স্তর ভেদ করে মাটিতে পৌঁছতে পারে না।

—এই স্তরটার কী নাম কাকামণি ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—তোমার আবার নামটা চাই, না ? নাম হোলো আইয়োনোস্ফিয়ার (Ionosphere)—শুদ্ধবাংলায় বলা যেতে পারে 'আয়নিত মণ্ডল'।

ঠাকুমা হেসে বললেন, তুমি শুদ্ধবাংলায় বললেও আমি কিছু বুঝতে পারলেম না।

—তাহলে একটু ব্যাখ্যা করে বলতে হয়।

অণু যখন বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বিকর্ষণের শক্তি অর্জন করে, তখন তাকে 'আয়নিত' বলা হয়।

বায়ুমণ্ডলের এই উপরের স্তরে যে গ্যাস রয়েছে, তার অণুগুলি বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পন্ন, তাই এই স্তরটাকে বলা হয় 'আয়নিত স্তর'। এর একটা ধর্ম হোলো কম স্পন্দনের রেডিও ঢেউগুলোকে শুষে নেওয়া। কিছু শুষে নেয়, কিছু আয়নার মতো প্রতিফলিত ক'রে ফেরত পাঠিয়ে দেয় নীচে। আমাদের পরিচিত রেডিও ঢেউগুলি এখানে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে নামে। মাটিতে আবার ধাক্কা খেয়ে উপরে ওঠে। ওপরে উঠে এই স্তরে আবার ধাক্কা খেয়ে আবার নামে—এইভাবে পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত চলে !

—আচ্ছা কাকামণি, সব ঢেউ এখানে আটকে যায় ?

—আটকে যায় তারা, যাদের স্পন্দন সেকেণ্ডে দশহাজার বার (সাইকেল) থেকে তিনকোটি বার (সাইকেল)! সংক্ষেপে ১০ কিলো সাইকেল থেকে ৩০ মেগা সাইকেল পর্যন্ত !

—তাহলে তো মুশকিল হোলো !

—তবে দেখা গেছে যাদের স্পন্দন সেকেণ্ডে তিনকোটি সাইকেল থেকে তিনহাজার কোটি সাইকেল অর্থাৎ ৩০ মেগা সাইকেল থেকে ৩০,০০০ মেগা সাইকেল তারা পেরিয়ে যেতে পারে এই স্তর।

—যাদের কম্পন খুব বেশী শুধু তারাই পেরিয়ে যেতে পারে ?

—হ্যাঁ, যাদের শক্তি বেশী তারাই পেরিয়ে যেতে পারে। অবশ্য এরাও যে সব সময় এই স্তরটা ভেদ করে যেতে পারে তা নয়! অর্থাৎ নকল উপগ্রহ থেকে এই ধরনের রেডিও ঢেউ ছাড়লে, তারা যে সব সময় নীচের যন্ত্রে সাড়া জাগাবে তা নয়!

—কখন কখন পারে না ?

—এসব ঢেউয়ের গতিপথ যদি এই স্তরের ওপর খুব আড় হ'য়ে পড়ে, অর্থাৎ খুব বড় কোণ ক'রে পড়ে, তাহলে তারা সব সময় এই স্তরটা ভেদ নাও করতে পারে! অনেক সময় দেখা গেছে যে নকল উপগ্রহটা যখন গ্রাহক স্টেশনের ঠিক উপর দিয়ে যায়, শুধু তখনই তার সঙ্কেত ধরা পড়ে গ্রাহক স্টেশনের যন্ত্রে !

তাই উপগ্রহ থেকে বেশী সংবাদ পেতে গেলে অনেকগুলো গ্রাহকস্টেশন তৈরী করতে হয় নীচে। উপগ্রহ যে পথ ধ'রে যায়, সেই পথের নীচে জায়গায় জায়গায়।

—আচ্ছা কাকামণি, সোবিয়েৎ স্পুৎনিক দু'টোতে কী মাপের রেডিও ঢেউ ব্যবহার করা হয়েছিল সংবাদ পাঠাবার জন্যে ?

—প্রত্যেকটাতে দু'টো ক'রে প্রেরকযন্ত্র ছিল! একটা থেকে ২০ মেগাসাইকেলের ১৫ মিটার লম্বা ঢেউ আর একটা থেকে ৪০ মেগাসাইকেলের ৭½ মিটার লম্বা ঢেউ ছাড়া হ'য়েছিল!

—রেডিও সঙ্কেত না হয় পেলাম। কিন্তু সব কিছু তো রেডিও সঙ্কেত নয়। অনেক কিছুই তো জানতে হয়। তাপ জানতে হ'তে পারে। মহাজাগতিক রশ্মির খবর জানতে হতে পারে। যে কুকুরটা খোলের মধ্যে রয়েছে তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের খবর জানতে হতে পারে—আরো কত কী জানার আছে! এগুলো তো আর রেডিও সঙ্কেত নয়। এগুলো জানবো কেমন ক'রে?

—প্রত্যেক ধরনের সংবাদকে সংখ্যায় প্রকাশ করে সেই সংখ্যাকে সঙ্কেতের আকারে, সিগন্যালের আকারে নীচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

—সিগন্যাল শুনলে তো আমার রেলস্টেশনের সিগন্যালের কথা মনে হয়। বলে সুমিত্রা।

—ও সিগন্যাল নয়। এ সিগন্যাল মানে সঙ্কেত। বৈদ্যুতিক সঙ্কেত। একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

মনে কর, তুমি মহাজাগতিক রশ্মির কণাগুলোকে গুনতে চাও, আর, এই গোনার জন্য তুমি নকল উপগ্রহে একটা যন্ত্র বসিয়েছ।

—হ্যাঁ, কাকামণি, এই বিষয়টাই পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দাও! বলে অমর।

—একেবারে পরিষ্কার হয়ত হবে না। কেননা, এগুলো বুঝতে গেলে অনেক জানতে হবে। তবে একটা মোটামুটি ধারণা দিচ্ছি।

মনে কর, এই গোনার যন্ত্রটার উপর যতবার একটা ক'রে মৌলিক বস্তুকণা পড়ছে ততবার একটা ক'রে ঝিলিক উঠছে। প্রত্যেকটা ঝিলিক একটা ক'রে বিদ্যুতের ধাক্কা (pulse) সৃষ্টি

করছে একটা 'রেডিও সারকিটে'! যে পথ বেয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে, সেই পথটাকে বলে সারকিট।

—প্রত্যেকটা ঝিলিক একটা করে বিদ্যুতের ধাক্কা পাঠালে রেডিও সারকিটে। তারপর?

—মনে কর পরপর এই রকম কয়েকটা ধাক্কা (pulse) সারকিটে পৌঁছানোর পর এই সারকিটটা থেকে সঙ্কেত ছড়িয়ে পড়ল। একটা নির্দ্দিস্ট সময়ের মধ্যে ক'টা এই ধরনের সঙ্কেত পাওয়া গেল তাই গুনে জানা যেতে পারে সেকেণ্ডে ক'টা ক'রে বস্তুকণা যন্ত্রটায় পড়েছে।

সুমিত্রা বলে, সময়ের কথা বলতেই আমার মনে পড়ে গেল ঘড়ির কথা! আচ্ছা, উপগ্রহের ভিতরে যে ঘর থাকবে তার দেওয়ালে ঘড়ি থাকবে তো?

—ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় মাপার জন্য যন্ত্রেতেই ব্যবস্থা থাকবে। সেটা অবশ্য ঘড়ি নয়।

—তা থাকুক! উপগ্রহের ভেতরে যে ঘর তার দেওয়ালে ঘড়ি থাকবে কিনা ব'লো!

—দেওয়াল ঘড়ি ওখানে কাজ করবে না। উপগ্রহ যতক্ষণ একই গতিতে চলবে, ততক্ষণ তার ভার থাকবে না। ঘড়ি যাবে থেমে।

—হাতঘড়ি? হাতঘড়ি চলবে না?

—তা চলবে। হাতঘড়ি তো ভারের ওপর নির্ভর করে না।

ঠাকুমা বললেন, অনেক কিছু তো বললে, বরেন! আসল কথাটাই যে বাদ পড়ে গেল!

—কোন্ কথা, মা?

—উঠে তো গেলে! ঘর তৈরী করলে, হাওয়া তৈরী করলে, সবজির বাগান করে বসে রইলে—পৃথিবী থেকে মালপত্র আমদানীরও ব্যবস্থা করলে। কিন্তু, পৃথিবীতে কি ফিরবেই না? লোকের

অসুখ-বিসুখ করতে পারে, মন ভেঙে যেতে পারে—পৃথিবীর জন্যে মন কেমন করতে পারে, কত কী হতে পারে! ফিরলে, কেমন করেই বা ফিরবে? এ সম্বন্ধে তো কিছুই বললে না। মানুষের মন তো! যদি জানে যখন খুসী ফিরতে পারবে, তখনই সে আশ্বস্ত হবে।

—হ্যাঁ, মা, ঠিকই! এই ফেরার সমস্যাটার * সম্পূর্ণ সমাধান হয় নি বলে মানুষ সাহস করে উপগ্রহে পা বাড়াতে পারছে না। দ্বিতীয় স্পুৎনিকের কুকুরটা তো শূন্যেই মরে গেল!

—কে? লাইকা?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা কাকামণি, 'লাইকা' কথাটার মানে কি? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—ওটা রুশ কথা। মানে যে কুকুর কেবল চেঁচায়।

ঠাকুমা বলেন, নামটা ভাল হয় নি কিন্তু! মানুষের জন্যে ওই তো প্রথম প্রাণটা দিলে? ওকে কিন্তু ফিরিয়ে আনা উচিত ছিল। ও ফিরতে পারবে না জেনে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল।

—এই ফিরে আসার সমস্যাটার সহজ সমাধান না হলে মহাকাশ যাত্রা সফল হবে না। রকেট ছোঁড়া সহজ, তাকে ফিরিয়ে আনা শক্ত।

ঠাকুমা হেসে বললেন; দেখিস্ মানুষের মুখের কথার মতো না হয়—যেটা বেরিয়ে যায় সেটা আর ফেরে না।

—না, মা। এর ব্যবস্থাও হচ্ছে।

অমর ও সুমিত্রা দুজনে একসঙ্গে বললে, এবার সেই ব্যবস্থাটার কথাই শুনবো।

ঠাকুমা বলেন, এটা শুনলে আমিও আশ্বস্ত হবো। জানবো, ঈশ্বর আমাদের এই উন্নতিটা সত্যি সত্যিই চেয়েছেন।

---

*পরিশিষ্ট দেখুন

অমর ফোঁস করে উঠে বললে, তুমি আর ঠাকুর ঠাকুর করো না, ঠাকুমা! সেদিন বিজ্ঞানের মাস্টার মশাই বলছিলেন 'ঠাকুর ঠাকুর' করে নাকি আমরা উৎসন্নে গেছি!

বরেন বললে, এবার তুই বাজে কথা বলছিস, অমর! বিজ্ঞানীদের মনে বিদ্বেষ থাকলে তাঁরা সত্যকে আবিষ্কার করবেন কেমন করে? সমস্ত প্রকার বিদ্বেষের বিষ অন্তর থেকে নাশ করতেই হবে।

এটাই বিজ্ঞানের এই সমৃদ্ধির যুগে দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে আসছে। তা যাক্, এবার আমি উপগ্রহ থেকে ফেরার কথাটাই বলবো।

॥ নয় ॥

বরেন বলে, নকল উপগ্রহ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে গেলে একটা বিশেষ ধরনের আকাশযান দরকার হবে। নামবার সময় তার গতি কমানোর ব্যবস্থাটা নিখুঁত করতে হবে।

—আচ্ছা কাকামণি, এক কাজ করলে তো হয়? বলে অমর।

—কী? বলো।

—জেটটাকে বা গ্যাসের ফিন্‌কিটাকে উলটো দিকে ঘুরিয়ে দিলেই তো হয়? যেদিক দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে যায়, গতি তো তার উলটোদিকেই হয়।

—ঠিকই বলেছো, ব্রাউন (Braun) সাহেব এমনি একটা ব্যবস্থার কথা লিখে গেছেন। মনে কর, যানটা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে অর্থাৎ তার মুখটা আছে পুবদিকে আর লেজটা আছে পশ্চিমে। নামবার সময় হলে তার মুখটাকে পুবদিকে আর লেজটাকে পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হোলো।

—কী করে করা যাবে?

—এই রকম ঘোরানোর উদ্দেশ্যে ছোটো ছোটো জেট ইঞ্জিন থাকবে মূল ইঞ্জিনটা ছাড়া। এই ছোট ইঞ্জিনগুলো থেকে জেট বের করে দিয়ে ঘুরিয়ে নেওয়া হবে। তারপর মুখটা পুবে আর লেজটা পশ্চিমে আসলে, বড় ইঞ্জিনটা চালিয়ে দিলে গতি কমে আসবে। বেশী নয়—এই ধরো ঘণ্টায় হাজারখানেক মাইল গতি কমিয়ে দিলেই তা পথ থেকে পড়ে যাবে আর নামতে থাকবে—কিছুক্ষণ নামার পর—বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কিছুটা প্রবেশ করে—এই ধরো মাইল পঞ্চাশেক ওপরে—আবার মুখটাকে গতির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে! গতি নিয়ন্ত্রণ ক'রে ক'রে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব। কিন্তু এই গতি নিয়ন্ত্রণ করতে এত বেশী জ্বালানি লাগবে যে এই ব্যবস্থাটা মোটেই কার্যকরী হয়ে উঠবে না। আগেই তো বলেছি জ্বালানির পরিমাণ রকেটযানের পক্ষে খুব একটা গুরুতর বিবেচনার বস্তু। নানাদিক দিয়েই।

তাছাড়া, বায়ুমণ্ডলে বায়ুর বাধাকে এই বেগ কমানোর কাজে লাগাতে পারা যায়। এতে জ্বালানি বাঁচে; আর তার জন্যে রকেটযানটার ভারটাও কম হয়।

—কিন্তু, কাকামণি, বায়ুর মধ্যে দিয়ে নামবার সময় পুড়ে যাবে তো? উল্কারা যদি পুড়ে যায়, তাহলে রকেটই বা পুড়বে না কেন?

—হ্যাঁ, ভীষণ তাপ উৎপন্ন হয়!

—কত, কাকামণি?

—যদি কোনো উপগ্রহ পৃথিবীর গায়ে গায়ে গোলপথে তার চারদিকে ঘুরতো, আর তার গতির সমস্ত শক্তিটা তাপে বদলে যেতো, তাহলে অঙ্কের হিসেব করে দেখা গেছে তার প্রত্যেক গ্রাম ওজনের জন্য তাপ উৎপন্ন হোতো ৭৪,৭২০ ক্যালরী!

—এই তাপটা তো কমানো যায়? এমন জিনিসও তো আছে যা খুব বেশী তাপ সইতে পারে? সেই জিনিসের পাত দিয়ে উপগ্রহটাকে মুড়ে দিলেই হোলো!

—সে চেষ্টাও চলেছে ; কিন্তু অন্যরকম নামার কৌশলও প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সব কৌশলের মধ্যে দুটো প্রধান কৌশল আজ আলোচনা করবো।

প্রথম কৌশলটায় তাপ কমে যায়। দ্বিতীয়টায় জ্বালানি কম লাগে! কেন না 'ব্রেক' কষতে কম জ্বালানি খরচ হয়। আগে প্রথম কৌশলটা বলি! মনে কর, উপগ্রহটা পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে বহু উপরে, হয় গোলাকার পথে কিংবা উপবৃত্তের পথে, অর্থাৎ চ্যাপটা গোলপথে, পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে!

—বহু উপরে মানে ?

—ধরো, পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের কয়েকগুণ উঁচুতে। নামবার সময় বেগ কমিয়ে একটা ধনুকের মতো পথে একটা বিরাট উপবৃত্তের (এলিপ্‌সের) অর্দ্ধেক পথ বেয়ে ঠিক বিপরীত দিকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করল।

—এই রকম ভাবে পড়বার সময় বেগ তার নিশ্চয়ই বেড়ে গেল ?

—হ্যাঁ, বাড়ল বইকি! সেই বেগের জন্যে গায়ে তাপও বাড়ল। এবার করল কি ? বেগটা কমিয়ে দিল। কমিয়ে দিলেও বেগটা তাকে আবার একটা উপবৃত্তের পথে ঘোরাবার পক্ষে যথেষ্ট। এই বেগের ফলে আবার বায়ুমণ্ডল ছেড়ে উঠে গেল নতুন একটা উপবৃত্তের পথে বেয়ে। এই দ্বিতীয় উপবৃত্তটা প্রথম উপবৃত্তের চেয়ে ছোটো হবে অবশ্যই। আর এর জন্যে একটা সুবিধে হয়ে গেল। যে তাপটা সে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে জমিয়েছিল তার খানিকটা সে শূন্যে বিকিরণ করে দিলে! শূন্য তো একটা প্রকাণ্ড রেফ্রিজারেটরের মতন। এই দ্বিতীয় উপবৃত্তের পথ ধরে আবার যেই পৃথিবীর নীচে পূর্বের বিন্দুতে পৌছল কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে, তখন আবার ব্রেক কষে বেগ কমিয়ে দিলে। তখনও যা বেগ তার জোরে সে আবার একটা তৃতীয় উপবৃত্তের পথ ধরে ওপরে উঠে গেল। আবার তাপ কমিয়ে নিলে। এমনি করে

তা ক্রমশ-ছোটো-হয়ে-আসা উপবৃত্তের পথে ঘুরে ঘুরে তাপটাকে নিয়ন্ত্রিত করে ধীরে ধীরে মাটির দিকে নামতে থাকবে।

ঠাকুমা বললেন, বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে পরপর উপবৃত্তের পথগুলো শাঁখের গায়ে রেখার মত মাথার কাছে ক্রমশঃ ছোটো হয়ে আসবে!

—হ্যাঁ, মা, কল্পিত শাঁখটার মাথার কাছটায় ধরো পৃথিবীটা আছে।

—কিন্তু অতবার ব্রেক কষতে হবে, জ্বালানি তো খরচ হবে অনেক। বলে অমর।

—নিশ্চয়ই, বেগ বাড়াতে যেমন জ্বালানি খরচ হয়, বেগ কমাতেও তেমনি লাগে। বেগের চক্রবৃদ্ধি হারের ওপর জ্বালানির খরচ নির্ভর করে। আবার বেগ যদি চক্রবৃদ্ধি হারে কমে আসে তখনও সমান জ্বালানি খরচ হয়, যদি বাড়ার হার আর কমার হার একই হয়।

—তাই বুঝি দ্বিতীয় কৌশলটা বের করা হয়েছে?

—হ্যাঁ!

—এটা কী রকম কাকামণি?

—আগে আরও ওপরে উঠে যাওয়া তারপর নামা! এতে সুবিধে অনেক। সব চেয়ে বড় সুবিধে জ্বালানি অনেক বাঁচে।

—এরকম কেন হয়, কাকামণি, মূল কারণটা কি?

—মূল কারণটা এই যে উপগ্রহ যত ওপর দিয়ে যাবে তার গতিবেগ তত কম হলে চলবে।

এবার মনে কর, নামার একটা সোজা পথ আছে; আর একটা ঘুরপথ আছে। কক্ষ থেকে একটা আধখানা উপবৃত্ত ধরে বায়ুমণ্ডলে নামা যেতে পারে—এটা সোজা পথ! আবার আর এক রকমেও হয়! চলতি বেগটা বাড়িয়ে দিয়ে শূন্যে কক্ষপথের উপরে বহুদূর উঠে যাওয়া, তারপর একটা আগের চেয়ে বড় উপবৃত্ত

ধরে আবার নামা! অর্থাৎ আরও ওপরে উঠে আবার নামা! এটা ঘুরপথ! হিসেব করে দেখা গেছে এই দ্বিতীয় পথে জ্বালানি খরচ কম! তা যাক্, এবার যেমন করেই হোক এসো আমরা আকাশ থেকে নেমে পড়ি! এখন রাত ক'টা অমর?

—ঐ তো রাত্রি চারটে বাজল! ভোর হয়ে এল!

—এবার গল্প বলো, কাকামণি?

—গল্প? কেন এতক্ষণ কী বললাম?

—এতক্ষণ বিজ্ঞান বললে, এবার একটু এই বিজ্ঞানের গল্প বলো। মানুষ এই শূন্যে পাড়ি দিয়ে কোথা থেকে কোথায় যাবে! কী দেখবে সেখানে! কতদূর যেতে পারবে আর কতদূরের পর আর পারবে না এগোতে! ভবিষ্যতে কত গতিবেগ সৃষ্টি করতে পারবে? এই সব!

ঠাকুমা সায় দেন, হ্যাঁ, তাই বল, বরেন! আমার আয়ু তো শেষ হয়ে এসেছে, শুনে যাই একদিন মানুষ কোথায় পৌঁছবে! জেনে যাই! হয়তো সুমিত্রা অমরের জীবনকালের মধ্যেই—

—হ্যাঁ, মা, আমাদের জীবনকালে না হ'লেও সুমিত্রা অমরের জীবনকালের মধ্যে মানুষ হয়তো সৌরজগতের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে!

॥ দশ ॥

সুমিত্রা আরম্ভ করে, এবার কাকামণি, আমাদের যাত্রা শুরু হোক!

বরেন বলে, পৃথিবীর সবচেয়ে নিকট যে প্রতিবেশী চাঁদ সেখানেই মানুষ পদক্ষেপ করবে।

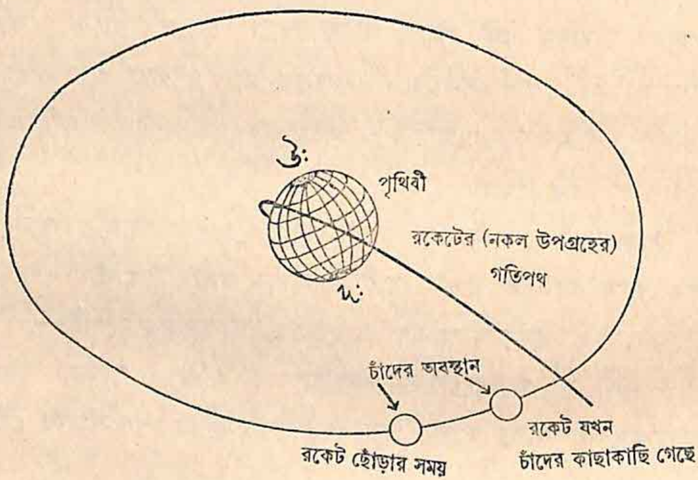
এই তো সেদিন কয়েক মাস আগে সোবিয়েত দেশ চাঁদের উপগ্রহ দিলে পাঠিয়ে—চাঁদের অপর পিঠে কি আছে তা জানবার

জন্যে। জানলেও। চাঁদের অন্য পৃষ্ঠের ফটো পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

—ফটো কী করে পেল ?

—রকেটের মধ্যে যে ক্যামেরা ছিল সেই ক্যামেরার ছবিকে টেলিভিশনের নিয়মে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে।

আজ পৃথিবীতে যন্ত্র দিয়ে যন্ত্রকে উপদেশ দেওয়ার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। যন্ত্র দিয়ে নেওয়া তথ্য যন্ত্রের সাহায্যে দূর



যে পথ ধরে রকেট (নকল উপগ্রহ) চাঁদের কাছ দিয়ে গেল।

দূরান্তরে পাঠাবার কৌশলও জানা গেছে। আর, যন্ত্রের সাহায্যে বহুদূরের যন্ত্রকে খুশিমতো চালানো সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের এদিকটার আলোচনা করব আর একদিন। সেও একটা দীর্ঘ ইতিহাস। যন্ত্রের মানুষ তৈরী করা হচ্ছে। যন্ত্রের মস্তিষ্ক পর্যন্ত!

চাঁদে প্রথম নামবে একটা রবোট (Robot) ট্যাঙ্ক।

ঠাকুমা বলেন, রবোট কী রে ?

—যে যন্ত্র মানুষের মত বিচার করতে পারে, আর এই বিচারের ওপর পূর্ব নির্দিষ্ট কাজও করতে পারে।

ঠাকুমা অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন, বিচার ?

—যে বিচারগুলো যান্ত্রিক, সেইগুলোই করতে পারে মা! ধরো, অঙ্ক কষতে পারে। অঙ্কের নিয়ম যদি জানা থাকে।

—নিয়ম কি বার করতে পারে ? তৈরী করতে পারে নতুন অঙ্ক ?

—যতদূর পারে যান্ত্রিক নিয়ম। প্রতিভার কাজ যন্ত্র করতে পারে না। কতদূর পারে দেখা যাক। যেখানে কতকগুলি বাঁধা নিয়মে সূত্রের প্রয়োগ হয়, কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বশে আবিষ্কারের একস্তর থেকে অন্যস্তরে যাওয়া যায়, সেখানেই যন্ত্রের প্রয়োগ সম্ভব। থাক্—একথা পরে একদিন বল্‌বো। হ্যাঁ, প্রথম যা চাঁদে নামবে তা হবে এমনি একটা বিচারসক্ষম যন্ত্র। রবোট। রবোট ট্যাঙ্ক। ধাতুর গাড়ি।

—কী করে এটাকে চাঁদে পাঠানো হবে ?

—নিশ্চয়ই রকেটে করে। মাটি থেকে রেডিও সঙ্কেত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এই রকেট, মনে কর, এবার চাঁদের দিকে নামছে! এবার গতি কমানো দরকার!

—কী করে কমাবে ?

—রকেটের নাকের মধ্যে যে জেট মোটরটা রয়েছে সেটা চল্‌তে আরম্ভ করলে সম্মুখে, তীব্র বেগে।

গ্যাসের জেট বেরুতে শুরু করল। অর্থাৎ বিপরীত বেগ সৃষ্টি হলো যার ফলে সম্মুখ বেগ গেল কমে। পৃথিবী থেকে অটোমেটিক যন্ত্র দিয়ে তার নামবার দিক নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। জ্বালানির শেষ বিন্দুটুকুও ফুরিয়ে ফেলে ব্রেক কষে—ব্রেক কষতে কষতে সে নামল চাঁদের পিঠে। নামবার সময় নরম পাথর চূর্ণের ধূলো উড়ল বহুদূর উপর পর্যন্ত।

—বহুদূর পর্যন্ত উঠল কেন ?

—হাওয়া নেই, তাই! তাছাড়া পৃথিবীর টানের চেয়ে চাঁদের

টান যে অনেক কম! তাই একধাক্কায় অনেকদূর উঠলো ধূলো !

—নরম পাথর বললে কেন ?

—বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন যে চাঁদের ধূলো এমন ধরনের যে তা সামান্য আঘাতে হুহু করে ছড়িয়ে পড়ে।

—রকেটটা কোন মুখ করে নামল ?

—নাকটা উঁচুতে রেখে নামলে। পুঁতেই গেল অর্দ্ধেকটা। তুবড়েও গেল!

—মাথাটা বাঁচিয়ে রাখলে !

—হ্যাঁ, তারপর ওপরের অংশে একটা দরজা খুলে গেল আর ধীরে ধীরে একটা ট্যাঙ্ক বেরিয়ে এল। নীচে চাকার ওপর চওড়া চেন লাগানো ট্যাঙ্ক। ইংরেজীতে বলে ক্যাটারপিলার ট্যাঙ্ক।

—ক্যাটারপিলার বলে কেন ? ক্যাটারপিলার মানে কি ?

—ক্যাটারপিলার মানে শুঁয়োপোকা। উঁচু-নীচুতে চলবার সময় এই ট্যাঙ্ক সর্বদাই গোটা শরীরটা যেন মাটিতে বুলিয়ে বুলিয়ে চলে শুঁয়োপোকার মতো। তাই নামকরণ হয়েছে ক্যাটারপিলার।

—অত ভারী জিনিস, দুম্ করে প'ড়ে ভেঙে যেতে পারে তো।

—না, ধীরে ধীরেই নামলে! পৃথিবীর ওপর যা তার ওজন ছিল, তা এখানে কমে প্রায় ছ'ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে যে।

—আচ্ছা, কাকামণি, ট্যাঙ্কটা নামবার সময় কাত হয়ে পড়তে তো পারে ?

—কাত হলেও টাল সামলে নিয়ে খাড়া হয়ে যাবে।

সুমিত্রা বলে, ছোটো বেলায় আমার একটা পুতুল ছিল। কাত করে শুইয়ে দিলে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে খাড়া হয়ে যেতো ! তেমনি, না ?

—হ্যাঁ, সেই রকম !

—ধরো যদি একেবারে চিৎপাত হয়ে পড়ে যায়।

—এ ধরনের ট্যাঙ্ক তাহলেও চলতে পারবে!

—কী আশ্চর্য! ওপরে পা তুলে পিঠের ওপর চলতে পারে?

বরেন হেসে বললে, হ্যাঁ, তাও পারে!

যাই হোক্, যেই নেমে স্থির হয়ে দাঁড়ালে, অমনি ভেতর থেকে একটা ফ্রেম বেরিয়ে এল। এই ফ্রেমটাতে দুটো যন্ত্র বসানো। একটাতে বেতার সঙ্কেত ছাড়া হবে, আর একটায় বেতার সঙ্কেত ধরা হবে।

—কিন্তু কোন্‌দিকে চলবে কী করে ঠাহর করলে?

—এবার বেরিয়ে এল ট্যাঙ্কের প্রধান ইন্দ্রিয়। খুব একটা জটিল যন্ত্র! যেন একটা বিরাট শামুক শুঁড় বের করে দিলে আশে-পাশের অবস্থা ঠাহর করার জন্যে!

সুমিত্রা সোৎসাহে বলে, দেখেছি! দেখেছি! মাংসল দেহটা বেরিয়ে আসার পর মাথার দু'দিকে দু'টো পেরিস্কোপের মতো শুঁড় বেরিয়ে আসে।

—হ্যাঁ, ঐ রকম শুঁড় একটা!

—এটা আসলে কী যন্ত্র, কাকামণি?

—এটা 'টেলিভিশন' ক্যামেরা। এটা নিজের থেকেই চারদিকে ঘুরতে পারে।

অমর বলে, আচ্ছা, কাকামণি, শুনেছি মানুষের চোখও এক ধরনের ক্যামেরা।

—হ্যাঁ, তাই তো!

—তারপর কী হোলো?

—চোখটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ট্যাঙ্কটা দেখে নিলে চারদিকের অবস্থা! আমরা কিন্তু পৃথিবীর মাটিতে বসেই টেলিভিশন যন্ত্রে ওর হালচাল সবই দেখতে পাচ্ছি!

—বাঃ। যেন একটা প্রকাণ্ড নলহীন পেরিস্কোপ বসানো

হয়েছে পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত! না, কাকামণি! বলে অমর।

—চমৎকার বলেছো! নলহীন প্রকাণ্ড পেরিস্কোপ! যেমন বিনাতারে বহুদূরে সংবাদ বা সঙ্কেত পাঠানোর বেলায় রেডিও যন্ত্র—তেমনি আড়াই লক্ষ মাইল উপরে দেখার জন্যে এই বিনানলের পেরিস্কোপ! বেশ বলেছো, অমর!

—আচ্ছা, ট্যাঙ্কটা তো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে দেখে নিলে! তারপর কী করলে? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—চারদিক দেখা যেই হয়ে গেল অমনি পৃথিবী থেকে আদেশ দেওয়া হোলো, ডাইনে চল বা বামে চল! অমনি ট্যাঙ্ক চলতে আরম্ভ করলে!

—আচ্ছা, কাকামণি, এই ট্যাঙ্কের মধ্যে আরো তো যন্ত্র আছে?

—আছে বইকি! তাপ মাপার যন্ত্র আছে, মাটির অবস্থা অর্থাৎ তা কতটা শক্ত কতটা নরম, তা বিচার করার যন্ত্র আছে। অন্যান্য অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে আছে আরো যন্ত্রপাতি! একটা মজার যন্ত্রের উল্লেখ না করে পারছি নে!

—কী সেটা?

—কয়েক ফুট গভীর থেকে মাটি তুলে আনার যন্ত্র!

—এর কী দরকার?

—যে গুঁড়ো পাথর দিয়ে চাঁদের মাটি তৈরী তার ঘনত্ব জানার জন্যে! রকেট চালিয়ে মানুষ নামবার আগেই এটা জানতে হবে! এই ট্যাঙ্কটার আসল কাজ হচ্ছে শক্ত মাটির খোঁজ করা, যেখানে মানুষ-বয়ে-নিয়ে-যাওয়া রকেটটা নামতে পারে। তা না হলে হয়তো 'চোরা বালির' মতো 'চোরা ধূলোতে' মানুষ শুদ্ধ রকেটটা যাবে হারিয়ে!

—এই ট্যাঙ্কটা কতদিন এই সন্ধানের কাজ চালাতে পারবে? জ্বালানি তো ফুরিয়ে আসবে?

—ফুরিয়ে তো আসবেই! তবে সঙ্গে আরো গোটাকতক ইঞ্জিন থাকবে যেগুলো সূর্যের আলো থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ট্যাঙ্কটাকে চালু রেখে দেবে!

ঠাকুমা বলেন, কিন্তু, বরেন, চাঁদের পিঠে কি সব সময় রোদ্দুর থাকবে? দিনরাত্রি তো আছেই! রাত্রি এলে তাপ পাবে কোথায়?

—হ্যাঁ, মা, দিনরাত্রি তো আছেই! তা ছাড়া রাতটা প্রকাণ্ড! আমাদের হিসেবে প্রায় চোদ্দ দিন! রাত্রিবেলায় ট্যাঙ্কটা চুপচাপ পড়ে থাকবে, কিন্তু ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার শুরু করবে চলতে! আর এই চলার সময় রেকর্ড করা খবরগুলো সংকেতের সাহায্যে পৃথিবীতে পাঠাতে থাকবে! এই ভাবে চলতে থাকবে প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর্ব। এই পর্বটা শেষ হলে মানুষ প্রথম যাত্রা করবে!

—চাঁদে নেমে মানুষ কী দেখবে?

—তার আগে চাঁদ সম্পর্কে যতদূর জানা গেছে তার কিছু কিছু বলে নিই! বৈজ্ঞানিকরা বলেন চাঁদ মৃত্যুপুরীর মতন!

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, রাত আছে, দিন আছে, তবু প্রাণ নেই?

—বলতে পারি না প্রাণের লেশ আছে কিনা! তবে দিন আছে, রাত আছে!

—চাঁদের দিনরাত্রি মিলিয়ে কত ঘণ্টা, কাকামণি? ক'ঘণ্টার দিন আর ক'ঘণ্টার রাত?

—দিনরাত মিলিয়ে প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিন আমাদের হিসেবে! এই সাড়ে উনত্রিশ দিনের অর্দ্ধেক সময় দিন আর অর্দ্ধেক সময় রাত!

—তাপ কী রকম?

—দিনের বেলায় দারুণ তাপ। বায়ুমণ্ডল নেই বলে সূর্যের কিরণকে সেখানে বায়ু চুইয়ে পড়তে হয় না। তাই সেই কিরণ

যেখানেই পড়ে সেখানটাই দারুণ তেতে ওঠে! যে তাপে জল ফোটে তার চেয়ে কুড়ি ডিগ্রী বেশী পর্যন্ত!

—তাহলে রান্নার তো খুব সুবিধে! উনুন জ্বালতে হবে না! ঠাকুমা সহসা বলে ওঠেন।

বরেন হেসে বললে, হ্যাঁ, মা, গরম ধূলোর ওপর পাত্র চাপিয়ে দিলে সব রান্নাই হয়ে যাবে—ডিম, মাংস, চচ্চড়ি, সবই!

কিন্তু রাত্রি বেলায়, দারুণ ঠাণ্ডা!

—শূন্যের নীচে কত ডিগ্রী, কাকামণি? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—শূন্যের প্রায় ১৬০ ডিগ্রী নীচে! পৃথিবীর কোনো স্থানেই এত ঠাণ্ডা নেই। হতেও পারে না!

—কতটা ঠাণ্ডা ঠিক বুঝতে পারছি নে তো, কাকামণি?

—এত ঠাণ্ডা যে সেই ঠাণ্ডায় আমাদের বায়ুমণ্ডলের প্রধান প্রধান গ্যাসগুলো সব জমে তরল হয়ে পড়বে। দিন-রাত্রির তাপের তফাত ২৮০ ডিগ্রী!

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা, দিনের বেলায় ছায়ায় কী রকম তাপ?

—খুবই ঠাণ্ডা!

চাঁদের পিঠে দিনের বেলায় মাত্র কয়েক হাত তফাতের মধ্যে দু' বোতল জলের একটা বোতল রোদে আর এক বোতল ছায়ায় রাখলে যে বোতলটা রোদে থাকবে তার জলটা বাষ্প হয়ে বোতল ভেঙে বেরিয়ে আসবে, আর যে বোতলটা ছায়ায় থাকবে তার ভেতর জলটা জমে বরফ হয়ে যাবে!

—মাত্র কয়েক হাত তফাতেই এরকম হবে? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—হ্যাঁ। তাপ বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে হাওয়াও নেই, কোনো গ্যাসও নেই যে!

—আচ্ছা, কাকামণি, চাঁদে মাটির তলায় ঘর তৈরী ক'রে থাকলেই

হোলো! তাহলে হয়তো দিনের বেলার ভয়ঙ্কর তাপ আর রাত্রি বেলার ভীষণ ঠাণ্ডা দুটোর হাত থেকেই বাঁচা যেতে পারে!

—ঠিক বলেছো! বৈজ্ঞানিকরা হিসেব করে দেখেছেন যে মাত্র তিন ফুট নীচে দিনরাত্রির তাপমাত্রার এই নিদারুণ তফাতটা থাকবে না!

ঠাকুমা বলেন, আচ্ছা, তাহলে মাটির নীচে গর্তে কোনো-না-কোনো ধরনের প্রাণী থাকতে পারে তো?

—জল নেই, হাওয়া নেই! কেমন করে থাকবে, ঠাকুমা? অমরই উত্তর দেয়।

বরেন বলল, এ-কথা যে মানুষের মনে আসে নি তা নয়! বলি শোনো, চাঁদের পিঠে একটা নীচু জায়গার নামকরণ হয়েছে 'বৃষ্টির সমুদ্র' (Sea of Rains)। তার দক্ষিণ দিকটা পাহাড়ী জায়গা। এখানে একটা ছোটো আগ্নেয়গিরির মুখের মতো একটা খাল দেখা যায়। এই খালের ভেতর সূর্যের আলো পড়লে ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত আলোর বিচ্ছুরণ হয়। এই অদ্ভুত আলা সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চাঁদের দিনের দুপুরে। তারপর দুপুর পেরিয়ে গেলে তার তেজ থাকে কমতে। তখন দেখে মনে হয় সেই গর্ত থেকে পঙ্গপালের মেঘের মতো কী যেন উঠে আসছে!

আরো অনেক জায়গায় গহ্বর থেকে এমনি পঙ্গপালের মেঘের মতো কালো মেঘ উঠ্‌তে দেখা গেছে! এমনি আরো অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখা যায়! মানুষ এ সবের মুখোমুখি না দাঁড়ানো পর্যন্ত এসবের যথার্থ ব্যাখ্যা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে থেকে যাবে!

ঠাকুমা বলেন, এমনও তো হতে পারে যে কীট জাতীয় কোনো প্রাণী চাঁদের গর্তে রয়েছে? ভেতরে হয়তো জল জমে রয়েছে শক্ত বরফ হয়ে, হয়তো অক্সিজেনের বদলে এমন কিছু পদার্থ আছে মাটিতে, যাতে প্রাণের কাজ চলে যেতে পারে।

—এগুলো কল্পনা করতে ভালো! বিজ্ঞানীদের বিচারে এসব কল্পনার মূল্য খুব কম!

সুমিত্রা বলে, চাঁদের ওপর অনেক কিছুই অদ্ভুত আছে। আমি সেদিন খবরের কাগজে চাঁদের পিঠের একটা ছবি দেখলাম। ছবিতে দেখলাম চাঁদের গায়ে চাকা-চাকা দাগ।

অমর যোগ দেয়, আমিও দেখেছি। আমার মনে হয়েছে বিরাট বিরাট সার্কাসের গ্যালারী বা স্টেডিয়াম! মধ্যিখানে খেলার জায়গা! চারদিকে গ্যালারী!

—তোর যেমন কথা? চাঁদে আবার খেলার স্টেডিয়াম? সুমিত্রা বাধা দেয়।

বরেন বলে, অমর মন্দ বলে নি! ওগুলো দেখলে এমনি মনে হয়। অন্য কোনো গ্রহ বা উপগ্রহে এরকম চিহ্ন দেখা যায় নি। সত্যিই অদ্ভুত! মানুষ যেদিন নামবে সেদিন কতই না অদ্ভুতের মুখোমুখি দাঁড়াবে!

—আচ্ছা, কাকামণি, চাঁদে প্রথম মানুষ নামার ঘটনাটা কী রকম হবে? যে রকেটে এই ট্যাঙ্ক পাঠানো হবে, মানুষ কি সেই রকম রকেটে চাঁদে নামবে? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—না, এর জন্যে একটা অদ্ভুত যানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। অনেকটা একটা বড় পিঁপড়ের মতো!

অমর অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলে, পিঁপড়ের মতো?

—তিনটে বড় বড় পা-ওয়ালা পিঁপড়ের মতো!

—গ্রুপফটো তোলার ক্যামেরা যেরকম তিন পা-ওয়ালা স্ট্যাণ্ডে বসানো হয় তেমনি?

—হ্যাঁ, অনেকটা সেই রকম। এই পা-গুলো আবার বাড়ানো যায় কমানো যায়। ধরো, প্রথম যে পা-টা বেরুলো সেটা পড়ে গেল গর্তে! যতক্ষণ নীচে শক্ত মাটি না পেল ততক্ষণ সে বাড়তে থাকল। যেই শক্ত মাটি পেল অমনি আর বাড়লে না,

বসে গেল। এই করে তিনটে পা শক্ত মাটি খুঁজে বসে পড়ল। যানটার ভারসাম্য রক্ষা হোলো। তারপর....

—তারপর?

—এবার মনে কর আমরা এখানে বসে টেলিভিশনের পর্দায় সব দেখ্ছি, আর আমি দেখে দেখে সব বর্ণনা করছি! ... এবার মহাকাশ জাহাজটার দরজাটা খুলে যাচ্ছে...

—খুব জোরে একটা শব্দ হচ্ছে না?

—না। একেবারে নিঃশব্দে! হাওয়া নেই বলে শব্দ নেই।

ঠাকুমা বলে ওঠেন, ওমা একী ভয়ঙ্কর! কেউ কাউকে ডাকলেও তো শুনতে পাচ্ছে না!

—এবার জাহাজের দরজা থেকে একটা হালকা ধরনের মই নেমে এল! সেই মই বেয়ে ঐ দেখো প্রথম মানুষ নামল, তার গায়ে এক অদ্ভুত ধরনের পোশাক!

—কী ধরনের পোশাক, কাকামণি? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—এর নাম স্পেস্ স্যুট (Space suit)। মহাকাশ ভ্রমণের পোশাক! শূন্যে ডুব দেবার পোশাক। জলে ডুব দেবার জন্যে যেমন বিশেষ ধরনের পোশাক আছে তেমনি শূন্যে ডুব দেবার জন্যেও আছে বিশেষ ধরনের পোশাক!

—কী রকম দেখতে? জিজ্ঞাসা করে স্বমিত্রা।

—অনেকটা সমুদ্রে ডুবুরিদের পোশাকের মতন। সঙ্গে থাকবে শ্বাস নেওয়ার জন্যে বায়ুভাণ্ডার, আর একটা ছোট্টো বেতার যন্ত্র—যেটা দিয়ে কথা বলা আর কথা শোনা দু'রকম কাজই চলবে! তাছাড়া, এটা এমন ভাবে তৈরী, যে বায়ুলেশহীন শূন্যে এই পোশাক পরে নামা চলবে। এর ভেতর এমন ব্যবস্থাও থাকবে যাতে দেহে একটা সাধারণ তাপমাত্রা বজায় থাকবে।

—কী দিয়ে তৈরী?

—অনেক বৈজ্ঞানিক প্ল্যাস্টিক দিয়ে এই পোশাক তৈরী করার কথা ভেবেছেন।

—পোশাকটার মোটামুটি চেহারা কেমন ?

—যেন কতকগুলো টিউব দিয়ে তৈরী !

সুমিত্রা হাসতে হাসতে বললে, আচ্ছা, কাকামণি, একশ বছর পরে এই রকম পোশাক ফ্যাশনে আসতে পারে তো তাহলে ? যেমন ধরো, কোমর থেকে গলা একটা টিউবে ঢোকানো, পা-দুটো দুটো টিউবে—হাতদুটোও তাই ! কী অদ্ভুতই না দেখতে হবে !

বরেন হাসতে হাসতে বললে, অতদূর আমিও ভাবি নি, সুমি ! তা যাক্....এবার এসো আবার টেলিভিশন পর্দার দিকে চোখ ফেরাই ! লোকটা তাড়াতাড়ি নামবার জন্যে প্রায় কুঁড়ি পঁচিশ ফুট উঁচু থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেখো, কেমন ধীরে ধীরে নামছে !

এবার দেখো লোকগুলো দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে ! এক একবার পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে প্রায় ২০ গজ—চল্লিশ হাত !

—চল্লিশ হাত ? সুমিত্রা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে !

—হ্যাঁ, চল্লিশ হাত !

—আচ্ছা কাকামণি, চাঁদে স্পোর্টস হলে তো পৃথিবীর সব রেকর্ড ভাঙা যাবে ! ২০০০ খৃষ্টাব্দে চাঁদে তো অলিম্পিক খেলাও হতে পারে ? অমর কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ ! আর কাজ নেই ? মানুষ যেন অলিম্পিক খেলার জায়গা খুঁজতেই চাঁদে যাচ্ছে ! বলে সুমিত্রা।

—নিশ্চয়ই অলিম্পিক ওখানেই হবে একশ বছর পরে, জোর দিয়ে বলে অমর।

ঠাকুমা বলেন, আচ্ছা বরেন, লোকটা লাফিয়ে নামল তো ধূলোয় ডুবে গেল না যে ?

—আগে তো ঐ সন্ধানী ট্যাঙ্কটা চালিয়ে মাটির ওপর নামবার উপযুক্ত শক্ত জায়গা বেছেই নেওয়া হয়েছে।

—ও, তা বটে!

—এবার দেখো লোকগুলো—এর মধ্যে অনেকগুলো লোক নেমে এসেছে—লোকগুলো পিঠে বড় বড় বাক্স চাপিয়ে জোরে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে!

—কী আছে বাক্সগুলোতে?

—ইলেক্‌ট্রিক হিটার আছে—সূর্যরশ্মি থেকে বিদ্যুৎ তৈরীর মোটরের পার্টস্ আছে, জমানো অক্সিজেন আছে, খাবার আছে, বায়ু পরিষ্কার করার যন্ত্র আছে, পাত্‌লা প্ল্যাষ্টিকের চাদর আছে, আরো কত কী আছে—

—তারপর কী করছে?

—নিকটে একটা পাহাড়ের তলায় গুহা দেখে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল!

এসো এবার ভিতরে কী করছে দেখি!

ঢুকেই মেঝের ওপর পাত্‌লা প্ল্যাষ্টিকের গোটানো চাদরটা মেলে দিচ্ছে। কয়েকজনে একটা প্ল্যাষ্টিকের গোল তাঁবুর মতো—তাঁবু খাটিয়ে দিচ্ছে। কয়েকজন অক্সিজেন ট্যাঙ্কের সঙ্গে প্ল্যাষ্টিক পাইপ জুড়ে এই তাঁবুর ভেতরে পাত্‌লা হাওয়া তৈরী করছে। দেখতে দেখতে তাঁবুটা ফেঁপে উঠল। দেখতে হোলো খুব বড় একটা সাবানের ফেনার বুদ্‌বুদের মতো!

—গুহার ভিতরে নিশ্চয়ই ঘোর অন্ধকার! দেখছে কী করে? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

বরেন হেসে বললে, ঐ তো দেখো ইলেকট্রিক টর্চ জ্বেলেছে! অদ্ভুত হয়েছে ঘরখানা! এস্কিমোদের ঘর 'ইগ্‌লু'র মতো! দরজায় চাবি আটকে রেখে দিচ্ছে পাছে ভেতরের হাওয়া যায় পালিয়ে।

—ছোট্ট ঘরে হাওয়া আটকে রাখলে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে হাওয়াটা খারাপ হ'য়ে যাবে যে! জিজ্ঞাসা সুমিত্রার।

—এমন যন্ত্র বসিয়ে ফেলেছে যাতে নোংরা হাওয়া পরিষ্কার হ'য়ে যাচ্ছে সব সময়!

—কিন্তু ঘরের ভেতরে যে ছায়া। শূন্যের তলায় ১৬০ ডিগ্রী ঠাণ্ডা যে! পোশাক খুললেই তো মানুষগুলো মরে যাবে!

—হ্যাঁ, তাইতো দেখো ইলেকট্রিক হিটারগুলোকে কাজে লাগিয়ে দিলে।

—বিদ্যুৎ পাচ্ছে কোথায়?

—ঐ যে এর মধ্যে বাইরে রোদের মধ্যে তাপ থেকে বিদ্যুৎ তৈরীর যন্ত্র বসিয়ে ফেলেছে কয়েকজন।

—আচ্ছা কাকামণি, শুধুই তো অক্সিজেন ট্যাঙ্কটা থেকে অক্সিজেনই পাচ্ছে। আমাদের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছাড়াও তো অন্য গ্যাস আছে!

—শুধু অক্সিজেন কেন? আরো দু-একটা গ্যাস মিশিয়ে নকল হাওয়া তৈরী করা হয়। শূন্যযাত্রার পথে এই রকম হাওয়া বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই রকম হাওয়াই তৈরী হচ্ছে এখানে!

—শুধু অক্সিজেন থাকলে ক্ষতি কি ছিল?

—বেশী তাপ লাগলেই যে দপ্ করে জ্বলে উঠবে! ভেতরের খাবার দাবার তাড়াতাড়ি নষ্ট হ'য়ে যাবে। তাছাড়া, এই নকল হাওয়া শব্দ বহন করার উপযুক্ত হওয়া চাই তো?

তাই অনেক বৈজ্ঞানিক 'আরগন' (Argon) নামের একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়ে নেবার প্রস্তাব করেছেন! এতে কথা বলার সুবিধে হবে। আরো অনেক কিছু বিবেচনা করে এই রকম মিশ্র গ্যাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে! যেমন ধরো, চাপ। গ্যাসের উপযুক্ত মিশ্রণের ওপর ভেতরের আবহাওয়ার চাপ নির্ভর করে। আবার এমন গ্যাস হওয়া চাই যা খোলের অদৃশ্য

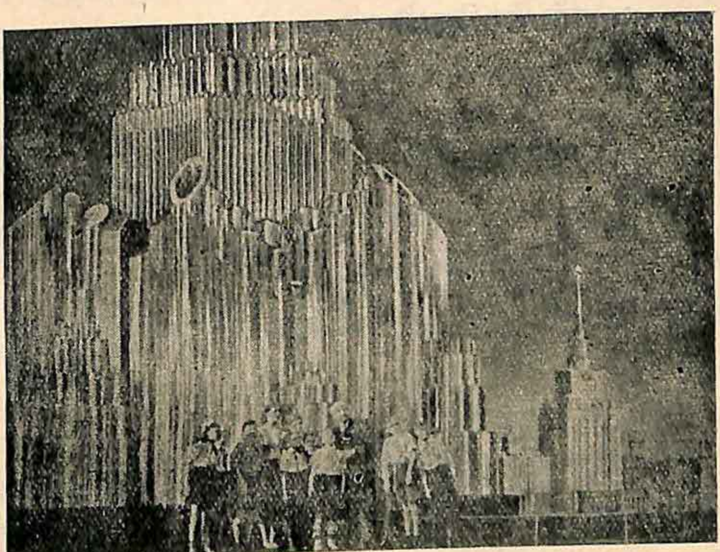
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বাইরে না বেরিয়ে যেতে পারে। সব দিক দিয়ে নাকি এই নিষ্ক্রিয় 'আরগন' (Argon) বেশ কাজে লাগবে।

—'নিষ্ক্রিয়' মানে কী কাকামণি?

—যা অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিলে গিয়ে নতুন পদার্থ তৈরী করে না।

অমর গম্ভীর ভাবে বললে, নিশ্চয়ই জ্বলেও না!

—তারপর কী হোলো, কাকামণি? ওরা তো ক্যাম্প তৈরী ক'রে বসে পড়েছে, জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।



ভবিষ্যতের রকেট স্টেশন

—এখন অপেক্ষা করছে পৃথিবী থেকে প্রথম মালবাহী রকেটটার জন্যে।

ঠাকুমা বলেন, বাবা! এখানেও মালগাড়ী, প্যাসেঞ্জার গাড়ী? হয়তো এক্স্‌প্রেস, মেলও থাকবে!

—কালক্রমে তা হবেই, মা!

—মালবাহী রকেটগুলোতে কী কী আসছে, কাকামণি !

—ধরো প্রথমটাতে অক্সিজেন এলো, দ্বিতীয়টাতে ক্যাটার-পিলার ট্যাঙ্ক এলো আরো কয়েকটা। তৃতীয়টাতে এলো খুব বড় বিদ্যুৎ তৈরীর স্টেশনের যন্ত্রপাতি ! তারপরেরটাতে মনে কর এলো রেডিও টেলিস্কোপ। এমনি ক'রে পর পর রকেটে মাল পৌঁছতে লাগলো পৃথিবী থেকে। শুরু হয়ে গেল চাঁদে শহর তৈরী ! মহাকাশগামী জাহাজের জন্যে ওঠানামার জায়গা !

—চালানের ওপর কতকাল ভরসা করা চলবে ? কাজকর্ম যত বাড়বে চালানও তো ততই বাড়াতে হবে ! বলে অমর।

—খুব বেশী দিন নিশ্চয়ই না।

ধীরে ধীরে হয়তো চাঁদের মধ্যে কাজে লাগানোর উপযুক্ত অনেক অনেক ধাতু মিলে যাবে। ধাতু ছাড়াও অন্যান্য মৌলিক পদার্থ পাওয়া যেতে পারে প্রচুর পরিমাণে।

হয়তো দেখা গেল মাটির নীচে বরফের জমাটবাঁধা স্তর। আমাদের পৃথিবীতে যেমন কয়লার স্তর ! এই স্তর থেকে যে শুধু জলই পাওয়া যাবে তা নয়, এই জল থেকে অক্সিজেনও পাওয়া যাবে।

—কী করে তা হবে ?

—জল যে একটা যৌগিক পদার্থ, অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন এই দুটো গ্যাস মিলিয়ে তৈরী। জলে উপযুক্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ উপযুক্ত কৌশলে প্রয়োগ করলে যৌগিক জল মৌলিক গ্যাস অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনে ভেঙে পড়ে।

—জল, বায়ু যেই পাওয়া যাবে, অমনি নতুন পৃথিবী গড়া শুরু হয়ে যাবে, না কাকামণি ? বললে সুমিত্রা।

বরেন আপন মনে বলে চলে, এ সবের পর একদিন নতুন যন্ত্রশিল্পের পত্তন হবে চাঁদে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নতুন কেন্দ্র ! চাঁদ মহাশূন্য যাত্রার মাঝপথে একটা

প্রকাণ্ড স্টেশন হ'য়ে দাঁড়াবে। তখন মানুষ শূন্যের সীমানা খুঁজতে বেরিয়ে পড়বে মহাকাশের জাহাজে পাড়ি দিয়ে!

॥ এগার ॥

বরেন বলে চলে, হয়তো আগামী দশ বা বিশ বছরের মধ্যে মানুষ চাঁদ, শুক্র, মঙ্গল, আর বুধ গ্রহে পৌঁছে যাবে।

—আচ্ছা কাকামণি, তার আগেও তো এটা ঘটে যেতে পারে?

—আজ যে কোনো সময়ে এটা ঘটে যেতে পারে। যে কোনো দিন খবরের কাগজের শিরোনামায় দেখতে পারি চাঁদে মানুষের প্রথম পাদস্পর্শ!

এই চাঁদ, শুক্র, মঙ্গল আর বুধ এরা মানুষের প্রথম পর্যায়ের লক্ষ্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে—

—দ্বিতীয় পর্যায়ে কী কাকামণি?

—দ্বিতীয় পর্যায়ে বৃহস্পতি।

—আচ্ছা, কাকামণি, যত দূরে যাবে তত তো বিপদ কমে আসবে? হয়তো মহাকাশে ছড়ানো সূক্ষ্ম বস্তু তত কমে আসবে।

—কিন্তু, সবচেয়ে আশঙ্কার কথা মহাকাশে বিপুল গতিতে ধেয়ে যাওয়া বস্তুপিণ্ড উল্কা। সাধারণ উল্কা ছাড়াও আর এক জাতের উল্কা আছে তাদি'কে ইংরেজীতে বলে 'asteroids'। এগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ। এক একটার ব্যাস অনেক মাইল হতে পারে। দশ বিশ পঞ্চাশ মাইলের ব্যাসওয়ালা এই সব ক্ষুদে গ্রহরা সংখ্যায় অনেক। অবশ্য খুব ছোটো গ্রহও আছে। কারও কারও ওজন কয়েক ছটাকও হতে পারে, আর কারও কারও ওজন কয়েক হাজার মণও হতে পারে। সম্ভবতঃ তারা সংখ্যায় অজস্র—আর তাদের মধ্যে কোনো একটার আঘাত লাগলে মহাকাশের জাহাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে।

—আচ্ছা, কাকামণি, এই সব ক্ষুদে গ্রহগুলো কতদূরে আছে?

—মঙ্গলের কক্ষপথের ওধারে।

যেমন সমুদ্রের ওপরে ডুবো পাহাড়ের শ্রেণী, তেমনি মহাশূন্যে এরা ইতস্ততঃ ছড়ানো বেগবান পাথরের রাশি!

দূরবীণে দেখলে মনে হবে এরা যেন সারি বেঁধে একসঙ্গে জমায়েত হয়েছে মহাশূন্যকে পাহারা দিতে! কিংবা মহাকাশের ওপর দিয়ে বিরাট বিরাট নুড়ির স্রোত বয়ে চলেছে! এই নুড়ির স্রোতে পড়লে রক্ষা নেই!

সমুদ্রেও তো জলের নীচে পাহাড় আছে! সেগুলো সব জরীপ করে মানুষ জাহাজের পথ ঠিক করেছে। ঠিক এমনি করে মহাকাশ জাহাজের যাতায়াত পথ ঠিক করতে হবে। আজ যেমন সমুদ্রের মানচিত্রে জাহাজ চলাচলের রেখা আঁকা হয়, তেমনি একদিন মহাকাশের মানচিত্রে মহাকাশ জাহাজের যাতায়াত পথের রেখা সব আঁকা হয়ে থাকবে। সেই মানচিত্র দেখে মহাকাশ জাহাজের ক্যাপটেনরা পথ ঠিক করবে। এটা অনেকদিন পরের কথা। প্রথমে কিন্তু এই উড়ন্ত পাথরের এক ঝাঁক দূর গ্রহদের দিকে যাবার পথে বাধা হয়ে থাকবে।

—আমার কী মনে হচ্ছে জানো, কাকামণি? বলে সুমিত্রা।

—কী মনে হচ্ছে রে?

—পর্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;

তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দ-রেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা!
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগ
সুদূরের লাগি
হে পাখা বিবাগী।

বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে!

বরেনও নিম্নস্বরে আবৃত্তি করলে,

"আকাশের খুঁজিতে কিনারা!"

—মঙ্গলের ওপরে যেতে কতদিন লাগবে কাকামণি? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—আজ পর্যন্ত সব চেয়ে শক্তিশালী যে জ্বালানি মানুষ আবিষ্কার করেছে রকেটে ব্যবহার করার জন্যে তার ওপর ভরসা করে যদি যাত্রা করি তো বৃহস্পতিতে যেতে আর ফিরে আসতে লাগবে ছ-বছর! শনিতে যেতে আর ফিরে আসতে লাগবে বার বছর আর ইউরেনাসে যেতে আসতে পুরো তিরিশ বছর!

ঠাকুমা বলেন, পুরো তিরিশটা বছর যদি পথে পথেই কাটল—তা সে মাটির ওপরই হোক আর মহাশূন্যেই হোক, তাহলে জীবনের কতটুকু পড়ে থাকবে কাজের জন্যে, সৃষ্টির জন্যে, আনন্দের জন্যে, সুখের জন্যে?

—আণবিক শক্তি যখন মানুষ রকেটে বা মহাকাশ জাহাজ চালনার কাজে লাগাতে পারবে তখন সবচেয়ে দূরের যে গ্রহ নেপচুন, প্লুটো তাদের কাছে যেতে আর ফিরে আসতে সময় যা লাগবে তা হয়তো হবে কয়েক সপ্তাহ! বড়জোর কয়েক মাস মাত্র!

—আচ্ছা, কাকামণি, তুমি কাছে গিয়ে ফিরে আসার কথা বললে কেন? মানুষ নামবে না? প্রশ্ন করে সুমিত্রা।

ঠাকুমা বলেন, আচ্ছা বরেন, ওসব দূর গ্রহ বা উপ-গ্রহের কথা থাক এখন। এখন বলো তো মঙ্গল শুক্রতে যাবে কখন? সেখানে নামবে না? যেতে কতদিনই বা লাগবে?

—আণবিক রকেট তৈরী হ'লে মানুষ মঙ্গল শুক্রতে নামতেও পারবে।

—আচ্ছা, কাকামণি, মঙ্গলগ্রহে নাকি জীবন আছে ? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা ।

—মঙ্গলগ্রহের অবস্থা বিচার করে অনেকে বলেছেন এখানে জীবন থাকতে পারে।

—মঙ্গল সম্বন্ধে কিছু কথা বলো না, কাকামণি ? মঙ্গলের রঙ কি লাল, কাকামণি ?

—হ্যাঁ, চুনীর মতো টক্‌টকে লাল। এই গ্রহটা নিয়ে বহুকাল ধরে মানুষ অনেক জল্পনা কল্পনা করে এসেছে !

—আকারে কত বড় ?

—পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোটো ! ব্যাস মাত্র ৪২১০ মাইল—পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় অর্দ্ধেক—

মঙ্গলে যা মোট বস্তু আছে—অর্থাৎ মঙ্গলের ভর (mass) পৃথিবীর ভরের এক শতাংশের একাংশ মাত্র !

মঙ্গলের দিন ২৭ ঘণ্টার চেয়ে একটু বেশী। বছর প্রায় ৬৮৭ দিনে।

—মঙ্গলে বায়ুমণ্ডল আছে ?

—একটা মিশ্রিত গ্যাসের মণ্ডল আছে বটে তবে তা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মতো ঘন নয়। সমস্ত গ্যাসগুলোর প্রকৃতি আর পরিমাণ সঠিক নির্দ্ধারণ না করা গেলেও এটা ঠিক যে অক্সিজেন খুব কম ! তাছাড়া মঙ্গলের আকাশে বড্ড মেঘ !

—বৃষ্টি হয়তো ?

—হয় বইকি, তবে অন্যরকম বৃষ্টি ! পাত্‌লা কাদার বৃষ্টি !

—সে আবার কি ? জল কোথায় ?

—জল আছে। কেন না বরফ আছে। মঙ্গলের দুটো মেরু চিরন্তন বরফে ঢাকা। ঋতু পরিবর্তনে এই বরফের বিস্তার কমে বাড়ে। বসন্তকালে বরফ কুঁচকে যেন মেরুতে জমে আর হেমন্তে শীতে মঙ্গলের কোমর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। অনেক গবেষণার পর জানা গেছে এই শাদা অংশ দু'টো নিশ্চয়ই বরফ !

—আচ্ছা, পাহাড়-পর্বত খুব বেশী আছে ?

—মোটেই না। বালিয়ারির মতো উঁচু জায়গা দেখা যায় বটে যেন ওপরটা কুঁক্‌ড়ে যায় মাঝে মাঝে। যেন বালির পাহাড়। হাওয়ায় জমা হয়, বিপরীত হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা, গরম ঠাণ্ডা কী রকম রে ?

—তাপমাত্রার তফাত আমাদের পৃথিবীর তাপমাত্রার তফাতের চেয়ে বেশী! শীতকালে শূন্য ডিগ্রীর নীচে আরও পঞ্চাশ থেকে আশি ডিগ্রী। শীতকালে মাঝখানে তাপ ২৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ওঠে দিনের বেলায়; রাত্রিতে শূন্যের নীচে যায় নেমে। মেরুপ্রদেশে গ্রীষ্মকালের দিনে তাপমাত্রা শূন্য থেকে পনেরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বেশী!

—চাঁদের মতো গায়ে দাগ আছে ? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—আছে। লাল গায়ের ওপর মাঝে মাঝে গাঢ়-রঙের দাগ। বলা হয় 'সমুদ্র'। সম্ভবতঃ এগুলো গাছপালা ঢাকা ভিজে মাটির অঞ্চল!

—কী রঙের এই দাগগুলো ?

—ঋতুতে ঋতুতে এদের রঙ বদলায়! যেগুলো মাঝামাঝি আছে বছরের বেশীর ভাগ সময় তাদের রঙ আসমানি নীল, ধোঁয়াটে বা সবুজ-ধোঁয়াটে! গ্রীষ্ম থেকে হেমন্ত পর্যন্ত অনেকগুলোর রঙ সাদাটে সবুজ!

—সব জায়গায় সমান রঙ ? গ্রহের কোমরের কাছাকাছি এই দাগগুলোর যে রঙ, মেরু আর কোমরের মাঝামাঝিও কি সেই একই রঙ ?

—না। মেরু আর মধ্যদেশের মধ্যে যে সব সাগর আর উপসাগর আছে, গ্রীষ্মকালে তাদের রঙ নীল আর সবুজ! হেমন্তে আবার খড়ের মতো রঙ—বাদামী ঘেঁষা!

ঠাকুমা বলেন, চাষের সময় ফসলের রঙ যেমন সবুজ আর

পাকার পর বাদামী ঘেঁষা হলদে, তেমনি? তাহলে তো বলতে হয় ওখানে ফসলের চাষ হয়!

—চাষ না হোক—প্রাণবন্ত সবুজ যে আছে তাতে সন্দেহ নেই! এই রঙবদলানো দাগগুলো যে সবুজ গাছপালার স্তর তা অনেক বৈজ্ঞানিক জোর দিয়ে বলেছেন!

রুশ বিজ্ঞানী তিখভ (Tikhov) ও আরো অনেকে বলেছেন যে মঙ্গলের উদ্ভিদের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর মেরুপ্রদেশের উদ্ভিদের সাদৃশ্য আছে!

—এত জানাই বা গেল কী করে?

—অন্যান্য গ্রহে উদ্ভিদ সন্ধান করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞানের নতুন এক শাখার পত্তন করেছেন!

—কী নাম? জিজ্ঞাসা করে অমর।

ঠাকুমা হেসে বললেন, হ্যাঁ, দাদুর আমার নাম চাই আগে!

বরেনও হেসে বললে, নাম Astrobotany অর্থাৎ গ্রহউদ্ভিদ বিজ্ঞান!

—আমি বড় হয়ে এই বিজ্ঞানটা পড়বো, কাকামণি!

—বেশতো! চমৎকার বিষয়! আমি যখন বুড়ো হ'য়ে যাবো তখন একদিন হয়তো তুমি আর সুমিত্রা একটা গাছ দেখিয়ে বলবে, কাকামণি, এই দেখো একটা মঙ্গলের 'মশ'গাছ—ওখানে ফুল ধরতো না। এখানে এসে ফুল ধরছে। আমি বলব, চলো দেখে আসি! দেখতে গিয়ে দেখব অবাক্ হ'য়ে, তুমি চাঙ চাঙ্ বরফ দিয়ে একটা গাছকে ঘিরে রেখেছো আর তার মাথায় ঝুড়ির মতো প্রকাণ্ড একটা ফুল ফুটেছে—লাল সবুজ নীল মেশানো অব্যক্ত রঙ তার!

—কী অদ্ভুত! আমার ভাবতেও আনন্দ লাগছে!

ঠাকুমা বলেন, আমি ভাবছি, প্রাণের কী বিস্তার! গ্রহ থেকে গ্রহে—হয়তো জগৎ থেকে জগতে, অনন্তময়!

—এবার তোমরা সবাই মিলে আবোলতাবোল বক্‌ছ কাকামণি, এবার বিজ্ঞানের কথা বলো! অমর আপত্তি করে।

—অর্থাৎ নাম বলো; গঠন বলো! হিসেব বলো! এই, না? তুই একটু চুপ ক'রে থাক্ না অমর, আমি আরো গোটাকতক জিনিস জেনে নি! বলে সুমিত্রা।

—আচ্ছা তোর প্রশ্ন শেষ হোক্ আগে!

—আর কী প্রশ্ন আছে তোমার, সুমিত্রা?

—গাছ রয়েছে যখন, তখন প্রাণীও নিশ্চয় আছে!

ঠাকুমা বলেন, অনেকদিন আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম যে মঙ্গল থেকে উড়ন্ত চাকতির মতো আকাশযানে মঙ্গলের একমেয়ে কোথায় যেন নেমেছিল!

আমরা ওদের ওখানে যাবার আগে ওরা আমাদের এখানে আসতে পেরেছে যখন তখন নিশ্চয়ই বিজ্ঞানে ওরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে!

—এসব কথা হয়তো কল্পনা। কিন্তু একটা ধারণা আমার মনে বারবারই উদয় হয়েছে।

ঠাকুমা বলেন, কী মনে হয়েছে তোর?

—মনে হয়েছে, গ্রহান্তরে জীব থাকতেও পারে। বিবর্তনে তারা কোথায় পেঁাছবে তা বলা যায় না। তাছাড়া গ্রহে গ্রহে বিবর্তনের ধারা নিশ্চয় ভিন্ন। অক্সিজেনের সমুদ্রে বিবর্তন আর কার্বন ডাই-অক্সাইড সমুদ্রে বিবর্তন দুটো ভিন্ন ধারার বিবর্তন হতে পারে। মনে হয়েছে, হাইড্রোজেন আর কার্বন দিয়ে প্রাণবীজ তৈরী হতে পারে, আর তা অক্সিজেন ছাড়াও অন্য দাহক পদার্থ দিয়ে প্রাণের কাজ চালিয়ে নিতে পারে। দেখা যাবে ভবিষ্যতে মঙ্গলের সত্যটা কী!

প্রাণ যে কেবল একটাই নির্দিষ্ট পথে বিকশিত হতে পারে তা সত্য বলে মনে হয় না।

ঠাকুমা বলেন, ঈশ্বরের বৈচিত্র্যের কী শেষ আছে, বরেন ?

—এবার আমার প্রশ্ন করার পালা কিন্তু, কাকামণি! আচ্ছা, চাঁদের গায়ের বৈশিষ্ট্য যেমন গায়েতে চাকাচাকা দাগ, মঙ্গলের গায়ের তেমন কি কোনো বৈশিষ্ট্য আছে ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—আছে। মঙ্গলের গায়ে জ্যামিতির সরল রেখার মতো সরলরেখা দিয়ে যেন জাল তৈরী হয়ে আছে। আরো দেখা গেছে যে তারা 'সাগর' থেকে বেরিয়ে আবার 'সাগরেই' পড়েছে। আবার, যেখানে দুটো দাগ মিশেছে সেখানেই একটা গাঢ় রঙের ছড়ানো দাগ হয়ে গেছে।

—আচ্ছা এই দাগগুলোর কি কোনো নামকরণ করেছেন বৈজ্ঞানিকরা ?

—ঠিক একশ বছর আগে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক Angelo Secchi নাম দিয়েছিলেন 'ক্যানাল'। সেই নামই চলে আসছে।

—তাহলে নিশ্চয়ই মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী আছেই। যারা এই ক্যানেলগুলো কেটেছে।

—১৮৯৩ সালে ইতালীর আর একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী গিওভ্যান্নি শিয়াপারেল্লি (Giovanni Schiaparelli) এই রকম যুক্তি দিয়েছিলেন।

আজকের বৈজ্ঞানিকরা বলেন অন্যরকম। তাঁরা বলেন, এই তথাকথিত 'ক্যানেল'গুলো উদ্ভিদের রেখামাত্র!

আবার অনেকে বলেছেন, এগুলো মঙ্গলের গায়ে মাটিতে ফাটল মাত্র।

ঠাকুমা বলেন, কেন, প্রাণ থাকতে পারে না ? প্রাণ কি পৃথিবীর একচেটে ?

—হয়তো নয়। দেখতেই পাবো, জানতেই পারবো। বেশী দিন তো নয়! হয়তো বিশ তিরিশ বছর! হয়তো কাল পরশু!

আর যারা যাবেন মঙ্গলে, তাঁদিকে তৈরী হয়েই যেতে হবে

মানুষেরই মতো বুদ্ধিমান, মানুষের মতই সভ্য প্রাণীর সংস্পর্শের জন্যেই তৈরী হয়ে।

—দেখা হলে দু-দল কী করে কথা বলবে? জিজ্ঞাসা সুমিত্রার।

বরেন হেসে বলে, তা কী করে বলি বল? হয়তো নানা রঙের আলো দিয়ে কথাবার্তা চলবে।

—আচ্ছা, কাকামণি, মানুষ যখন চাঁদে বাস করতে শুরু করবে বা মঙ্গলে ফেলবে ছাউনি, তখনো তো মানুষ গান গাইবে? তখনো তো কেউ কেউ লিখবে কবিতা?

—হয়তো কেন? নিশ্চয়ই। আমাদের পৃথিবীর এই চেনাসুর নতুন প্রকৃতির বায়ুমণ্ডলে কী অদ্ভুতই না শোনাবে!

—কবিতা?

—ভাবতেও পারি নে! কী হবে ভাষা! কী হবে বিষয়বস্তু!

—কাকামণি, তুমিও কী সুমিত্রার পাল্লায় পড়ে বিজ্ঞান ভুলে সুর আর ছবি আর কবিতা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলে? অমর ক্ষুণ্ণ হয়।

বরেন হেসে আত্মসংবরণ করে বললে, হ্যাঁ তাই তো! বলো আর কী জানতে চাও।

—মঙ্গলের কথা তো বললে, কাকামণি! অন্যান্য গ্রহদের কথা বলো এবার।

—মঙ্গলের পর শুক্র। সকালের শুকতারা আর দিনান্তে সাঁঝের তারা। কবিদের ভাষায় সৌন্দর্যের দেবী।

—মাপজোখ কী? পৃথিবী থেকে কতদূর?

—মঙ্গলের চেয়ে কাছে—এক কোটি মাইল কাছে—মঙ্গল পৃথিবীর চেয়ে সূর্য থেকে দূরে কিন্তু শুক্র পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের কাছে।

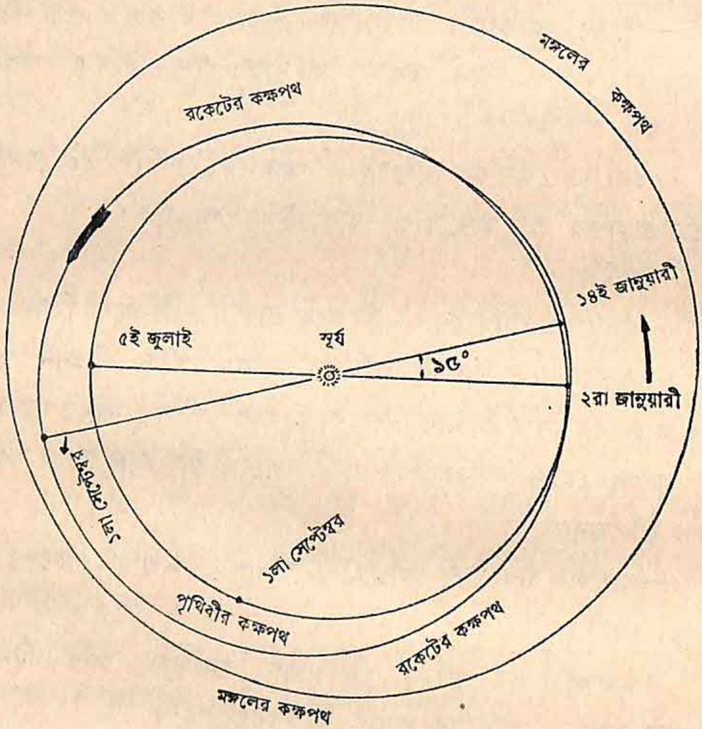
—শুক্রের উপরও কি গ্যাসমণ্ডল আছে?

—আছে! জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন এই গ্যাসমণ্ডল প্রধানতঃ জলীয় বাষ্প। তবে বাষ্প যেমন স্বচ্ছ, এ তেমন স্বচ্ছ নয়—ঘোলাটে।

—মুখের ওপর ঘোমটার মতো! না, কাকামণি? সুমিত্রা বলে বসে।

—হ্যাঁ।

—এই মণ্ডলটা কত পুরু? অমর প্রশ্ন করে।



মঙ্গল, পৃথিবী ও নকল উপগ্রহের কক্ষপথ।

—অনেক ঘুর পথে হিসাব করে দেখা গেছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চেয়ে তিন চার গুণ পুরু!

—দিনে রাতে তাপের তারতম্য কত, কাকামণি?

—আমরা এই মণ্ডলের উপরের তাপমাত্রাটাই জানতে পেরেছি। যেদিকে রোদ পড়ে সেদিকে ৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড; আর যেদিক

সূর্যের আড়ালে অর্থাৎ যেদিকে রাত্রি সেদিকে তাপ শূন্য ডিগ্রীরও ২৩ ডিগ্রী নীচে।

—শুক্রের 'বায়ুমণ্ডলে' কী কী গ্যাস আছে, জানা গেছে কি ?

—মনে হয় প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড, আর নাইট্রোজেন আছে। অক্সিজেন খুব সামান্য।

—আচ্ছা কাকামণি, প্রাণ আছে তো ? সুমিত্রা আবার জিজ্ঞাসা করে।

—অসম্ভব নয়।

—গাছেরা তো কার্বন ডাই-অক্সাইডে বাঁচে। গাছ তো থাকতে পারে।

—পারে।

—কিন্তু গাছে অক্সিজেন ছাড়ে। গাছ থাকলে অক্সিজেন এত কম হোতো কি ?

—বলা যায় না। অক্সিজেন সমুদ্রে বাস করতে করতে পৃথিবীর প্রাণীরা দেহে যে সব কৌশল তৈরী করে নিয়েছে বাঁচবার জন্যে, সেইগুলোই যে বাঁচার একমাত্র কৌশল তা বলা যায় না। আমার মনে হয়—প্রাণী সম্ভব। নতুন ধরনের প্রাণী।

—হয়তো আমাদের চেয়ে অনেক সুন্দর, অনেক নরম !

—তুই চুপ কর সুমি। আমরা বিজ্ঞান শুনছি, আজগুবি গল্প শুনছি না। যতদূর জানা গেছে তাই জানবো। আন্দাজ করব কেন ? কী বল, কাকামণি ?

—দু'জনেই ঠিক। বড় বড় আবিষ্কারের পেছনে বড় বড় দুঃসাহসিক আন্দাজ আছে কিন্তু, অমর! থাক এ প্রসঙ্গ, একদিন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা করব। কী করে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়। কী পথে হয়েছে! সে এক অদ্ভুত কাহিনী !

—এত বাষ্প যখন তখন হয়তো দেখা যেতে পারে শুক্রের ওপর

সবটাতেই হয়তো সমুদ্র থৈ থৈ করছে—নামার মতো ডাঙ্গা নেই! আচ্ছা কাকামণি, তা হ'তে পারে না? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—হতে পারে বইকি! তবে তার চারপাশে একটা উপগ্রহ সৃষ্টি করে সেখান থেকে লাল ভাটা (Infrared) আলোতে ফটো তুলে দেখা যাবে তার মাটির গঠন। আর এই উপগ্রহের উপর যে 'মানমন্দির' তৈরী করা হবে তার সাহায্যে সব খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

—লাল ভাটার আলোয় ফটো? তার মানে?

—সাধারণ আলো ছাড়াও, অদৃশ্য আলোতে—লালের চেয়ে দীর্ঘতর ঢেউয়ের আলোতে ফটো তোলা যায়। এই আলো মেঘ বলো, কুয়াশা বলো, কিছুতেই আটক হয় না। তাই এই আলোতে ফটো তুললে মেঘ কুয়াশার আড়ালের জিনিসেরও পরিষ্কার ফটো তোলা যায়।

ঠাকুমা বলেন, কত জিনিসই যে মানুষ আবিষ্কার করেছে! সব একসঙ্গে জানাও যায় না! বোঝা তো দূরের কথা!

—এই লাল ভাটার আলো কী সব জিনিস থেকেই ছড়িয়ে পড়ে?

—সূর্যরশ্মির সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের আলোকরশ্মি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে এগুলো শক্ত জিনিসে পড়লে প্রতিফলিত হয়ে পড়ে। সেই প্রতিফলিত আলোয় ফটো তোলা হয়।

—আচ্ছা, তারপর মানুষ কোন দিকে যাবে, কাকামণি? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—বুধের দিকেই চলো। এটা সূর্যের আরো কাছাকাছি।

—মাপজোখটা প্রথমেই বল!

—বুধকে ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলা হয় বালকগ্রহ। চাঁদের চেয়ে সামান্য একটু বড়ো। ব্যাস প্রায় ৩০০০ মাইল। বছর ৮৮ দিনে।

চাঁদের সঙ্গে আর একটা মিল আছে। বুধ সব সময় চাঁদের মতো সূর্যের দিকে এক পিঠ রেখে ঘোরে!

—গ্যাসমণ্ডল আছে?

—না থাকার মধ্যেই! যে পিঠে সূর্যালোক পড়ে সে পিঠের তাপ ৪১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই তাপে সীসে গলে, টিন গলে। অনেকে বলেন, এই গলা সীসে আর টিন ধাতুর বিরাট বিরাট হ্রদ থেকেই সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়।

—বুধের অন্যদিকে?

—অনন্ত রাত্রির দেশ। মহাশূন্যের মতো শীতল! একদিকে টলটলে ধাতু আর একদিকে হয়তো জমাট পাথর, জমানো নাইট্রোজেন, জমানো অক্সিজেন!

—তাহলে নামবো কোথায়?

—সম্ভবতঃ এই দুই রাজ্যের মাঝামাঝি কোনো স্থানে।

—পাহাড় আছে?

—না। এই গরম-শীতলের সীমারেখায় ফাপা আল্‌গা হয়ে জমা ধূলো আছে হয়তো! যেমন চাঁদে আছে। হয়তো শীতল দিকটাতেও এমনি! হয়তো ভাঙাচোরা মাটি আছে; আছে খাদের ধারালো কাণা!

—বুধ যদি সূর্যের এত কাছে হয় তাহলে সাধারণ মহাকাশ-জাহাজ তার কাছে যাবেই বা কী করে? সূর্য থেকে ছড়িয়ে পড়া মারাত্মক রশ্মি লেগে জাহাজটা তো ধ্বংস হয়ে যাবে!

—হয়তো বিশেষ ধরনের আচ্ছাদন দিতে হবে শূন্যের জাহাজটার গায়ে।

—সূর্যের আরো কাছে যেতে পারা যাবে? বুধের চেয়ে কাছে?

—সূর্যের কাছে গিয়েই বা কী হবে? কী হবে জ্বলন্ত আগুনের তাপে পুড়ে? বলে সুমিত্রা। আচ্ছা, কাকামণি, বুধ সূর্য থেকে কত দূরে?

—প্রায় সাড়ে তিন কোটি মাইল !

—এই সাড়ে তিন কোটি মাইল দূরেই যদি সীসে গলে তাহলে আরো কাছে গেলে কী না হবে ! তবে, কী হবে আরো কাছে গিয়ে, না ? কাকামণি ?

—জানতে হবে তো সূর্যকে ! জগৎ আর জীবনের স্রষ্টাকে তো জানতে হবে !

—কী জানবে ?

—মহাশূন্যে সূর্য একটা বিরাট ল্যাবরেটরী। এই ল্যাবরেটরীতে যে অকল্পিত চাপে, তাপে পদার্থের মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে তা জানতে পারলে এই পৃথিবীর ল্যাবরেটরীতে মানুষ তার কিছু কিছু নকল করতে পারে। নতুন অনেক কিছু আবিষ্কার করতেও পারে ! হিলিয়ম গ্যাস তো প্রথম আবিষ্কৃত হয় এই সূর্যে।

এই সূর্য থেকেই একদিন পদার্থের প্রথম উৎপত্তির আদি ইতিহাস, আর পদার্থের অনেক অজ্ঞাত প্রকৃতির কথা জানতে পারা যাবে !

—আচ্ছা, কাকামণি, সূর্যের কাছে যাওয়ার যেমন অনেক বাধা আছে, তেমনি কি সূর্যের থেকে বেশী দূরে যাওয়ারও বাধা আছে ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—আছে বইকি ! আগেই তো বলেছি ক্ষুদে উপগ্রহদের কথা ! যারা মঙ্গলের কক্ষপথের ওধারে শূন্যে উড়ন্ত পাথরের প্রবাহের মতো গতিরোধ করার জন্যে তৈরী হ'য়ে আছে !

—আচ্ছা কাকামণি, এই ক্ষুদে গ্রহদের প্রত্যেকেরই সূর্যের চারদিকে ঘোরার আপন-আপন কক্ষপথ আছে তো ? কক্ষপথগুলোর চেহারা কেমন ? গোল ? বৃত্তের মতো ?

—না, এদের নানাধরনের কক্ষপথ আছে। খুব চ্যাপটা বৃত্তের মতো সব পথ ! প্রকৃতি যেন এদের নিয়ে বড় বড় গ্রহ উপগ্রহদের পরিক্রমাপথের আকারের নানান পরীক্ষা করেছে !

এদের কারো কারো কক্ষপথ সূর্যের কাছে বুধের কক্ষপথকে

ছেদ করেছে, আবার কারো কারো কক্ষপথ সূর্য থেকে বহুদূরের গ্রহ বৃহস্পতির কক্ষপথকেও ছেদ ক'রে গেছে।

—একজন বিরক্ত দেবতা যেন কাউকে গভীর শূন্যে আসতে দেবে না ব'লে ঢিল ছুঁড়ছে! বললে সুমিত্রা।

বরেন হেসে বললে, তা তুমি কল্পনা করতে পারো!

—খুব ইচ্ছে হয় আকাশে এদের কাছাকাছি গিয়ে দেখি এরা কী আর কেমন!

—মনে কর, আমরা মহাকাশ-জাহাজে চড়ে এই ক্ষুদে গ্রহদের রাজ্যে এসে গেছি। কাছাকাছি এসে বেগ দিলাম কমিয়ে। সামনে হয়তো দেখতে পাবো একটা বিরাট পাথরের মতো জিনিস ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের আলোয় সারা গা ধুয়ে ধুয়ে মন্থর গতিতে চলেছে!

—আকারটা গোল তো?

—না। গোল কেন হবে? কত কিম্ভুতকিমাকার হতে পারে তার ঠিকানা নেই।

—কাছে গেলে টেনে নেবে না তো?

—না। আকর্ষণ খুব, খুব কম!

—আচ্ছা, কাকামণি, কী জিনিস দিয়ে তৈরী এগুলো?

—পৃথিবীতে যে সব ধাতু পাওয়া যায় প্রায় সেই সব ধাতু দিয়েই তৈরী! হয়তো কোনোটাতে আছে লোহা, কোনোটাতে রূপো, কোনোটাতে বা সোনা!

—সোনা?

—হ্যাঁ, সোনা! প্রকাণ্ড একটা সোনার তাল! খাঁটিও হ'তে পারে! আবার অন্য ধাতুর সঙ্গে মিশেও থাকতে পারে!

—বাঃ কী সুন্দর দৃশ্য! ঘন কালো আকাশের পটভূমির ওপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড সোনার তাল ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের আলোকে ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করতে করতে এগিয়ে চলেছে! আচ্ছা, কাকামণি,

এরকম গোটাকতককে টেনে নিয়ে পৃথিবীতে নামিয়ে আনলেই তো হোলো !

—প্রায় অসম্ভব ! তবে মহাশূন্যে মানুষ যখন শহর গড়বে তখন তারা এগুলোকে দিয়ে বড় বড় প্রাসাদের ভিত তৈরী করতে পারে ! তবে এগুলোকে আর এক উদ্দেশে ব্যবহার করা যেতে পারবে।

—কী কাজ, কাকামণি ?

—খুব লম্বা কক্ষপথের একটা ক্ষুদে গ্রহের সঙ্গে মহাকাশ জাহাজটাকে আটকে দেওয়া যেতে পারে। আটকে দিলে জাহাজ-টাকে সে টেনে টেনে নিজের কক্ষপথ বেয়ে বেয়ে নিয়ে যাবে।

মনে কর, আমাদের এমনি একখানা শূন্যের জাহাজ পৃথিবীর কাছের এমনি একটা ক্ষুদে গ্রহের ওপর নোঙ্গর করেছে। ক্ষুদে গ্রহটা হয়তো তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাবে বৃহস্পতির কাছাকাছি। বৃহস্পতির কাছে এসে নোঙ্গরটা তুলে ইঞ্জিনটা চালিয়ে, বেগটা বাড়িয়ে বৃহস্পতিতে পোঁছে যেতে পারে। অর্থাৎ পথের জ্বালানি খরচ বেঁচে যাবে অনেক। তবে, সময় লাগবে অনেক বেশী।

—আচ্ছা, কাকামণি, কাছাকাছি গেলে বৃহস্পতিকে কেমন দেখায় ?

—কালো ভেলভেটের মতো অন্ধকারের পটভূমিতে বিরাট সোনালি রঙের একটা গোলাকার পিণ্ড।

চোখে পড়বে তার দুই মেরুর রূপোর মতো জ্বলজ্বলে শাদা ঢাকা। চোখে পড়বে সোনালি গায়ে কোমরের কাছাকাছি গাঢ় রঙের রেখা।

দেখবে স্বর্ণময় গ্রহরাজ চলেছেন বিরাট উপগ্রহ বা পারিষদ পরিবৃত হয়ে।

—এই উপগ্রহগুলো কত বড়ো, কাকামণি ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—আমাদের চাঁদের চেয়ে অনেক অনেক ছোটো। ব্যাস দশ

থেকে ষাট মাইল। সবগুলোই হয়তো বরফে ঢাকা। হয়তো এদের কোনো কোনোটাতে মানুষ একদিন মানমন্দির তৈরী করে আরো দূরের মহাকাশের জরীপ করবে।

—আচ্ছা, কাকামণি, গাঢ় রঙের দাগগুলো, কী?

—জানা যায় নি এখনো। তাছাড়া, ওপরের গ্যাসের মণ্ডলটার রঙ বদল হচ্ছে। লাল, নারাঙ্গী, হল্‌দে।

সুমিত্রা অবাক হ'য়ে বলে, এত হিমেও রঙ বদল হচ্ছে? আচ্ছা কাকামণি, কতটা হিম?

অমর বলে ওঠে, ও তো হিসেব করলেই বেরিয়ে যাবে। যদিও আমি অঙ্কটা জানি না।

—কিন্তু হিসেবে যা হয় তার চেয়ে পনেরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বেশী তাপ দেখা গেছে।

—কেন, কাকামণি? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—কে জানে? হয়তো আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে কিংবা পদার্থের অণুরা ভাঙছে-চুরছে। সঠিক কী জানা যায় নি।

—আচ্ছা, যে মণ্ডলটা আছে সেটা কত পুরু?

—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চেয়ে অনেক অনেক গুণ পুরু।

—ভেতরটায় কী?

—জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভিল্‌ড্‌ট্ (Wildt) বলেছেন: মধ্যে একটা ধাতুময় আঁটি। তার চারদিকে প্রায় পনেরো হাজার মাইল পুরু একটা বরফের আবরণ। জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাসেভিচ্ (Massevich) বলেছেন, ওপরের সাড়ে ছ'হাজার মাইল পুরু গ্যাসের চাপে জমানো হাইড্রোজেন মূল ভরটা (Mass) তৈরী করেছে! কে জানে?

—আচ্ছা কাকামণি, চলো আমরা এগিয়ে যাই! বলে সুমিত্রা।

—আচ্ছা তাই চলো! পিছনে বৃহস্পতি ছোট্ট হয়ে এল! সম্মুখে ভেসে উঠল সৌরজগতের সবচেয়ে সুন্দর গ্রহ শনি!

সোনার থালার মতো ভেসে উঠল শনি, তার চারদিকে বিরাট আংটির মত ঘেরটা নিয়ে।

অমর জিজ্ঞাসা করে, শনি কী দিয়ে তৈরী ?

—ঠিক জানা যায় নি। হয়তো বৃহস্পতির মতো হিম-শীতল গ্যাস দিয়ে তৈরী।

—তাপমাত্রা কত ?

—শৈত্যের মাত্রা বলো। শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নীচেও ১৫৫ ডিগ্রী। বৃহস্পতির চেয়ে পনেরো ডিগ্রী কম।

—আকারে কত বড় ?

—প্রকাণ্ড ব্যাসটা ৭৫,১০০ মাইল। পৃথিবীর ব্যাসের ন'গুণেরও বেশী !

—বৃহস্পতির মতো শনির গায়েও দাগ আছে কি ?

—আছে। কখনো হালকা রঙের, কখনো গাঢ় রঙের। মাঝে মাঝে উপরে গ্যাসের মণ্ডলেও রঙিন দাগ জাগে আবার মিলিয়ে যায়।

—আচ্ছা, কাকামণি, শনির উপগ্রহ নেই ?

—আছে বইকি ! ন'টা উপগ্রহ আছে। সব চেয়ে বড়টার নাম 'টিটান' (Titan)।

—বড়টা আকারে কত বড় ?

—চাঁদের আকারের দ্বিগুন।

—এর ওপরে কী আছে ? বরফ ?

—না। ওপরে আছে মিথেন (Methane) গ্যাসের আবরণ।

—'মিথেন' কী গ্যাস কাকামণি ? পৃথিবীতে পাওয়া যায় ?

—পৃথিবীতে প্রচুর। এ গ্যাস জলাভূমিতে পচা উদ্ভিদ থেকে ওঠে। তেলের খনিতে পেট্রোলিয়মের সঙ্গে থাকে। আর থাকে কয়লার খনিতে। আগুনের শিখার সংস্পর্শে এলে জ্বলে ওঠে। আবার, মানুষের জঠরের মধ্যে থাকে কোনো কোনো সময়ে।

—গ্যাসটার রঙ্ কি ? স্বাদ কেমন ? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—রঙও নেই, স্বাদও নেই।

—তাহলে, বিষ ?

—না, বিষ নয়। তাছাড়া এই গ্যাসটার সঙ্গে জৈব পদার্থের যোগাযোগ আছে অনেক দিক থেকে।

ঠাকুমা বিস্মিত হ'য়ে বলে ওঠেন, কী কাণ্ড!

—আচ্ছা, কাকামণি, এই আংটির মতো ঘেরটা কী ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—ছবি দেখে আমার মনে হয়েছে এই ঘেরটা ধব্‌ধবে শাদা রঙের একটা খুব খাটো ঘাগ্‌রা—নাচের সময় ঘুরপাক খাবার সময় কোমরের ওপর উঠে গেছে। বললে সুমিত্রা।

বরেন হেসে বললে, সুমিত্রার বর্ণনাটা বেশ হয়েছে। আসলে ওটা উল্কাপ্রবাহ। উল্কাগুলো লম্বা পাতের মতো। এদের অনেকগুলো নাকি ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা।

—কী অদ্ভুত! সুমিত্রা বলে ওঠে।

—আচ্ছা কাকামণি, শনির পর সূর্য থেকে আরও দূরে কোন গ্রহ ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—শনি পেরিয়ে ইউরেনাস (Uranus)। সূর্য থেকে ১৮৮ কোটি মাইল দূরে।

—কত বড় ?

—ব্যাসটা ৩০,৯০০ মাইল। পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় চারগুণ।

—আচ্ছা, রঙ কী রকম ?

—সবুজ ধরনের।

—ওপরটা খুব ঠাণ্ডা, না ?

—শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নীচেও ১৭০ ডিগ্রী।

—গায়ে দাগ আছে ?

—আছে, বৃহস্পতি আর শনির গায়ে যেমন দাগ দেখা যায়, তেমনি সব দাগ আছে।

—ঋতু আছে তো ?

—আছে, তবে অদ্ভুত, জটিল ধরনের!

প্রত্যেক গ্রহই তার পরিক্রমাক্ষেত্রের ওপর হেলে থাকে। তার মেরুদণ্ড এই ক্ষেত্রটার সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট কোণ রচনা করে।

ঠাকুমা হেসে বললেন, প্রভুর দিকে মাথা নুইয়ে চলে, নারে ?

বরেনও হেসে বললে, অনেক সময় ঘাড় ফিরিয়ে বিপরীত দিকেও মাথাটা নোয়ায়। এই কোণটার পরিমাণের ওপর ঋতুর প্রকৃতি নির্ভর করে। ইউরেনাস কিন্তু সূর্যের দিকে এত হেলে আছে যে তার মেরুদণ্ডের দুটো প্রান্ত আর সূর্য প্রায় একই রেখায় এসে গেছে।

ঠাকুমা হেসে বললেন, প্রভু দূরে আছে বলেই কি একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ?

বরেন বললে, ঐ রকমই। তবে আরো একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সূর্যের দিকে মেরুদুটোকে পরপর ঘুরিয়ে দেয়।

—তাহলে তো দিনরাত্রি আছে ? অমর জিজ্ঞাসা করে।

—আছে বইকি! মেরুতে একদিন মানে বিয়াল্লিশ বছর। আর এক মেরুতে যখন দিন তখন অন্য মেরুতে গাঢ় অন্ধকার।

—মেরুদুটোর মাঝখানের জায়গায় দিনরাত্রি কেমন ?

—দিনরাত্রি সমান। প্রত্যেকটা একুশ বছর করে।

—আচ্ছা, কাকামণি, ইউরেনাসেরও তো উপগ্রহ আছে ?

—হ্যাঁ, পাঁচটা উপগ্রহ আছে।

—এরা কী রকম ?

—তা সঠিক জানা নেই—এতদূরে যে আমাদের চোখে এখনো সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

—ইউরেনাসের চেয়ে দূরে কী কোনো গ্রহ আছে ?

—আছে, নেপচুন। বরুণ। সূর্য থেকে ২৮১ কোটি মাইল দূরে।

—আচ্ছা, কাকামণি, নেপচুন থেকে সূর্যকে কত বড় দেখাতে পারে ?

—ছোট্ট তারার মতো।

সুমিত্রা বলে, আমরা যে প্রায় সৌরজগতের কিনারায় এসে পেঁছেছি। এর পর একমাত্র প্লুটো (পাতালেশ্বর) ছাড়া আর কেউ নেই।

—প্লুটো কেমন ? অমর জিজ্ঞাসা করে।

—এর সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় নি। আকারে পৃথিবী আর মঙ্গলের মাঝামাঝি। আমাদের ২৪৮ই বছরে এর এক বছর।

—ওর ওপরে কী আছে তার কিছুই জানা যায় নি ?

—ওপরটাতে জমাট বাঁধা গ্যাস আছে। সম্ভবতঃ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন আর মিথেন।

—আবার এখানেও মিথেন ? ঠাকুমা অবাক হ'য়ে বলেন।

—তাইতো অনুমান।

—আচ্ছা, কাকামণি, এটা পেরিয়ে গেলে কী দেখবো ? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—এটাই আমাদের সৌরজগতের শেষপ্রান্ত! এটা পেরিয়ে অনন্ত শূন্য! মানুষের সমস্ত ধারণার অতীত। আলাদা সূর্যের রাজ্য।

—আবার সূর্য ? অন্য সূর্য ? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—হ্যাঁ, আবার একটা আলাদা সূর্য!

—কী নাম ?

—জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন—প্রক্সিমা (proxima), কাছের তারা।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, কাছে ? কাছে মানে কত কাছে ?

—চার আলোক বৎসর দূরে। অর্থাৎ এর আলো যাত্রা শুরু করার চার বছর পরে পৃথিবীতে পেঁছায়, সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে চলেও।

সূর্য থেকে যে আলো আসে পৃথিবীতে আট মিনিটে সেই আলোকে এখান থেকে পৃথিবীতে পৌঁছতে চার বছর ধরে মহাশূন্য পেরিয়ে আসতে হয়।

ঠাকুমা বলেন, এইখানে এসেই বুঝি মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে। আলোর বেগে গেলেই যদি চার বছর লাগে এই কাছের তারায় যেতে তাহলে আমাদের মানুষের তৈরী বেগে যেতে যে যুগ পেরিয়ে যাবে—তা পূরণ করতে একটা কেন কয়েকটা পরমায়ুতেও কুলোবে না।

শেষে থামতেই হোলো মানুষকে। হার মানতে হোলো।

—তবু মানুষ চিন্তায় হার মানে নি। ভাবছে এর চেয়ে দূরেও কী করে যাওয়া যায়। এ-সব চিন্তা এখনো নিছক কল্পনা। তবু এই কল্পনা জল্পনা থেকেই ভবিষ্যতের পথ নির্দ্দেশ পাওয়া যেতে পারে।

—এই জল্পনা কল্পনাতেই আজকের রাতটা শেষ হোক্। সুমিত্রা বলে!

ঠাকুমা চকিত হয়ে বলেন, হ্যাঁ তাইতো! রাত যে ভোর হয়ে এল! ভোর বেলার স্বপ্ন নাকি সত্য হয়!

—হ্যাঁ, মা, এবার যা বল্‌বো তা স্বপ্ন বর্ণনার মতোই! কল্পনাবিলাসী মানুষ কল্পনা করেছে, সে আলোর গতিসম্পন্ন যানও একদিন তৈরী করবে। এমন কি ভেবেছে সে একদিন আলোর বেগের চেয়েও বেশী বেগ তৈরী করতে পারবে।

এখানে এসে অসম্ভবের সম্মুখীন হয়েছে। আলোর বেগ বিশ্বের মধ্যে তীব্রতম, চরমতম বেগ। এর চেয়ে বেশী বেগ হতে পারে না।

এর চেয়ে বেগ বেশী হলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যা আমাদের ধারণার মধ্যে আসে না—যদিও—

অমর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, যদিও

—যদিও গণিতের হিসাবে আসে।

—গণিতের হিসাবে আসে অথচ ধারণায় আসে না ?

—আমাদের 'সময়ে'র যে ধারণা তার ওলট পালট হয়ে যাবে !

যে 'সময়'কে আমরা অতীত থেকে বর্তমান, তারপর বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বহমান দেখি, তার প্রবাহ বিপরীতমুখী হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমান পেরিয়ে অতীতের দিকে চলবে !

ঠাকুমা বলেন, এ কী অদ্ভুত কথা, বরেন ?

—হ্যাঁ, মা, যে গণিত সূত্র মহামনীষী বৈজ্ঞানিক এলবার্ট আইনষ্টাইন (Albert Einstein) আবিষ্কার করেছেন তার হিসেবে এই রকমই ঘটবে !

—আচ্ছা, কাকামণি, মূল হিসেবটা কি ?

—গণিতের সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে ছাড়া এটা প্রকাশ করা যায় না। সাধারণ কথায়ও প্রকাশ করা যায় না। এখানে এসে মানুষের সাধারণ কথার ভাষা হার মেনেছে। আজ এইটুকু মাত্র জেনে রাখো যে গতিভর আর সময়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। গতি যত বাড়ে, ভরও বাড়ে, কিন্তু সময় কমে !

—সময় মানে আমাদের সময় তো ? এই সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত কালটাকে টুক্‌রো করে যে সময় মাপছি সেই সময় তো ? জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুমা।

—না—যে পদার্থ চলেছে 'তার' সময় !

—'তার' মানে গতিশীল বস্তুর নিজস্ব লোকাল টাইম ? জিজ্ঞাসা করে সুমিত্রা।

—না, এটা লোকাল টাইমের ব্যাপার নয়। সূর্য ওঠা, সূর্য ডোবার সঙ্গে এর মিল নেই। এটা অন্য হিসাবের সময়।

—তবে কী সময় ?

—যে সময়কে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন দিয়ে মাপা হয়। আলোর গতিতে চললে 'সময়' নেই—তার মানে পরিবর্তন নেই !

আর এই যে 'ভর' যা আমরা ওজন দিয়ে মাপি, তারও হিসেব মেলে না—বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'ভর' 'ইন্‌ফিনিট' হয়ে যায়। 'ইনফিনিট'কে বাংলা করা শক্ত। বলতে পারো অনন্ত! অসীম। ইন্‌ফিনিট ভর মানে—অসীম ভর। যত বড় সংখ্যাতেই মাপো না কেন, তার চেয়ে বেশী হবে!

ঠাকুমা বলেন, আচ্ছা বরেন, এটা গণিতের হিসেব, না সত্যি সত্যিই এমন হয়?

—যতদূর পরীক্ষা করা গেছে তাতে এ তত্ত্ব নির্ভুল বলেই মনে হয়!

—কাল নেই? কিংবা ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে অতীত? এসব ধারণা তো অঙ্কের মতো মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আমাদের ভাষায় কুলোচ্ছে না! আমাদের ধারণা প্রকাশের মধ্যেই কোথাও গোলোযোগ আছে! হয়তো আমাদের সাধারণ ধারণাগুলো বদলাতে হবে!

—থাক মা ওকথা! আমার বলার অধিকার নেই! অনেকে বলেন এটা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব! তা যাক, এর হিসাবে আলোর গতি ছাড়িয়ে যাবার উপায় নেই!

—আচ্ছা, কাকামণি, আলোর গতিবেগের কাছাকাছি বেগও কি মানুষ তৈরী করতে পেরেছে? জিজ্ঞাসা করে অমর।

—পেরেছে বইকি! পদার্থ ভেঙে ফেললে তার মৌলিক কণা-গুলি যে বেগে চলে তা আলোর বেগের কাছাকাছি!

—'পদার্থ ভাঙা' মানে কি?

—পদার্থ বলতে আমি তার মৌলিক পরমাণুটার কথা বলছি।

ঠাকুমা বলেন, পরমাণু যদি, তাকে আবার ভাঙবে কী করে!

—আর একদিন এই তত্ত্ব বলব। পরমাণু একটা বিপুল রহস্য। সৃষ্টির আদি রহস্য লুকোনো আছে পরমাণুর সৃষ্টিতে আর ধ্বংসে।

অমর বলে, আচ্ছা, পরে একদিন শুনবো! এখন বল না, কাকামণি, কী করে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগ সৃষ্টি করা যেতে পারে?

—ইঞ্জিনের মধ্যে যে জ্বালানি থাকবে তাকে নিঃশেষে শুদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে ফেলতে হবে। পদার্থ থেকে একেবারে শক্তিতে! এই শক্তিকে জেটের মতো—ফিন্‌কির মতো—যেদিকে রকেট যাবে তার বিপরীত দিকে বের করে দিতে হবে! শক্তির প্রবাহ চলে আলোর বেগে!

তাই রকেটটা আলোর বেগ পেয়ে যাবে।

—ব্যস্‌! তাহলে তো হয়েই গেল! অমর বলে।

—না, অত সহজে হয় না। সমস্ত শক্তিটাকে ব্যবহার করা যায় না। কিছুটা বেগের বদলে তাপে বদলে যায়। আর এই ভীষণ তাপ দ্রুত বিকিরণ না করতে পারলে রকেট পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তবু বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, মানুষ হয়তো কয়েক বছরের মধ্যেই আলোর বেগ অর্জন করতে পারবে।

এত বেগ নিয়েও সে মহাশূন্যের রহস্যের কতটুকুই বা জানতে পারবে? ক'টা সৌরজগৎই বা আবিষ্কার করবে?

—তাহলে কী হবে? অনন্ত শূন্য অজানাই থেকে যাবে?

ঠাকুমা হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বলেন, কেন? বিরাট শূন্যের জাহাজে চেপে ভেসে ভেসে মানুষ চলবে—বংশপরম্পরা ধরে চলবে—একদল মানুষ বুড়ো হয়ে মরে যাবে, তাদের ছেলেমেয়েরা এসে জাহাজের যন্ত্র চালাতে বসবে—তারা আবার মরে গেলে যন্ত্র চালাতে বসবে নাতি নাত্‌নীরা—এই করে চলতে থাকবে! একদল মানুষ মহাশূন্যে চলবে বংশপরম্পরা ধরে!···

বরেন সন্দিগ্ধ হয়ে বলেন, কিন্তু পথেই জন্ম, পথেই মৃত্যু—এরকম জীবন কোনো মানুষ চাইবে কি?

ঠাকুমা বলেন, এ এক মহাযাত্রা ভুবনের তীর্থে তীর্থে। এক সূর্য থেকে আর এক সূর্যে!

—কী জানি—মানুষ তা করতেও পারে। পাঁচশ বছর পরে মানুষের চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা আদর্শের কত না পরিবর্তন হতে পারে! আমরা কী করে অনুমান করবো?

ঠাকুমা বলেন, আমি পারি বরেন। আমার মনে হয় মানুষ স্বেচ্ছায় এই জীবন বরণ করে নেবে। মানুষের জীবনটাই তো যাত্রা! ভাবো না আমার কথাই!

শশী কুশারী লেনের এই সতেরো নম্বর বাড়িতে আমি তো সারা জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। কই, খারাপ লাগলো না তো?

ওদেরই বা খারাপ লাগবে কেন? আমার বাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর ওদের বাড়ি চলবে, এই যা তফাত! আমার মতোই ওদেরও পাশে থাকবে আপনার জন, আর থাকবে আশা—জগতের পরপারে পৌঁছবার আকাঙ্খা। বংশপরম্পরায় রক্তে রক্তে সেই আকাঙ্খার নেশা থাকবে মিশে। এই তীর্থযাত্রার নেশা!

বরেন গম্ভীর হয়ে গেল!

সুমিত্রা হঠাৎ বলে উঠল, ঐ দেখো, ঠাকুমা, সূর্য উঠছে। আমাদের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল!

বরেন বললে, শেষ হোলো আমার কাহিনীরও। আজকের মতো।

পরিশিষ্ট

এই বছরের ১২ই এপ্রিল সমগ্র পৃথিবীকে হতচকিত করে মস্কো থেকে ঘোষণা করা হোলো মহাশূন্যে পৃথিবীর মানুষের প্রথম অভিযান সফল হয়েছে। ২৭ বৎসর বয়স্ক মেজর য়ুরি আলেক্সেয়েভিচ গাগারিন নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে গ্রীনউইচ সময় ৭-৫৫ মিঃ-এ নিরাপদে পূর্ব নির্দ্ধারিত স্থানে অবতরণ করেছেন।

মানুষের প্রথম প্রণাম পৃথিবীকে! প্রথম পাকদণ্ডী পৃথিবী ঘিরে! নূতন যুগের আবির্ভাব! নক্ষত্রলোকে অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ! মাথার ওপর মহাকাশের স্তব্ধ নীলরহস্যের প্রথম অবগুণ্ঠন খোলা!

১৬ই এপ্রিল তারিখে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদামীর সভাপতি শ্রী এ, এন্, নেসমিয়ানভের বিবৃতি অনুসারে যে তথ্য জানা গেছে তা এই ঃ

১২ই এপ্রিল ১৯৬১ সকাল বেলায় মনুষ্যসৃষ্ট উপগ্রহ-মহাকাশযানে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম মানুষ পৃথিবী পরিক্রমা শুরু করেন। সোবিয়েৎ বিজ্ঞানীরা এই যানের নামকরণ করেছিলেন 'ভস্তক' অর্থাৎ "পূর্ব্ব"। নতুন যুগের আবির্ভাব সূচনা করবে বলেই কি ওঁরা এই নাম দিয়েছিলেন? কক্ষপথের নিকট বিন্দু পেরিজি (perigee) থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ছিল ১০৮·৬৭৫ মাইল আর দূরবিন্দু এপোজি (apogee) থেকে ১৮৭·৫৪২ মাইল। পৃথিবী পরিক্রমার সময় ৮৯·১ মিনিট।

এই উপগ্রহের মোট ওজন ছিল ৪৭২৫ কিলোগ্রাম বা প্রায় ১২৬½ মণ।

মানুষের অবস্থান আর তার পৃথিবী প্রত্যাবর্তনের জন্য সম্ভাব্য সকল রকম ব্যবস্থা ছিল এর মধ্যে। অনেক যন্ত্র জোড়া জোড়া ছিল। চালকের প্রকোষ্ঠের মধ্যে এমন যন্ত্রপাতিও ছিল য়ার সাহায্যে কক্ষপথে নিজের অবস্থান নির্ভুল ভাবে বুঝতে পারেন মহাকাশযানের পরিচালক।

সকাল ৯টা ৫২ মিনিট মস্কোসময়ে যখন দক্ষিণ আমেরিকার ওপর তখন গাগারিন বেতার যন্ত্রে জানালেন ঃ যাত্রা চলেছে নির্বিঘ্নে, চমৎকার আছি! ১০টা ১৫মিনিট মস্কোসময়ে যখন আফ্রিকার ওপর তখন আবার জানালেন ঃ ভারহীন অবস্থায় বেশ ভালই আছি !

বেলা যখন ১০টা ২৫ তখন মহাকাশযানের ব্রেক্‌কষার ইঞ্জিন খোলা হোলো আর যান "ভস্তক" নামতে শুরু করল পৃথিবীর দিকে। তারপর ১০টা ৫৫ মিনিটে মহাকাশযান "ভস্তক" মাটি স্পর্শ করল আবার। মানুষের ইতিহাসে পরম বিস্ময়কর একটা ঘটনা ঘটে গেল।

য়ুরি গাগারিন, মহাশূন্যের প্রথম পথিকৃৎ, ফিরে এসে বর্ণনা করলেন তাঁর শূন্যবিহারের অভিজ্ঞতার কথা।

প্রশ্ন করা হোলো, শূন্য থেকে কেমন দেখলেন পৃথিবীকে ? সূর্যকেই বা কেমন ? কেমন দেখলেন তারাদের, চাঁদকে ?

উত্তর দিলেন, পৃথিবীর যে পিঠে দিন সে পিঠে স্পষ্ট দেখতে পেলাম বড় বড় নদী, বনানী, বড় বড় নগরী, সমুদ্রতট রেখা। যখন সোবিয়েৎ দেশের ওপর তখন দেখতে পেলাম যৌথ খামারের প্রশস্ত কৃষিক্ষেত্র !

—কেমন দেখলেন সমুদ্রকে ? প্রশ্ন করা হোলো।

উত্তর দিলেন, যেন তমসাবৃত, মাঝে মাঝে ঝলক এখানে সেখানে !

—পৃথিবীর গোল আকার দেখতে পেলেন ? প্রশ্ন করা হোলো।

উত্তর দিলেন, দেখলাম বইকি! দিগন্তে চেয়ে দেখলাম তার একধারে তীব্র আলোয় ভেসে যাওয়া পৃথিবীর তল আর একধারে গাঢ় অন্ধকার আকাশ। ধরিত্রীকে ঘিরে রয়েছে যেন ধূসর নীল আলোর মেখলা। এই মেখলা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে, তার বর্ণ হয়ে আসে বেগুনি, তারপর কালো। কথায় প্রকাশ করা যায় না কী অপূর্ব্ব এই বর্ণসঞ্চার! আমাদের এই সমৃদ্ধ ভাষায়ও তার উপমা মিলছে না!

—কেমন দেখলেন দিন রাত্রির বিভাজন রেখা এই পৃথিবীর ওপর? প্রশ্ন করা হোলো।

উত্তর দিলেন, দেখলাম একটা কমলালেবু রঙের বলয়। এখানে রঙের বিস্তার খুব ধীরে ধীরে। প্রথমে নীলাভ তারপর ধূসর বেগুনি, তারপর প্রায় কালো!

—সূর্যকে দেখলেন কেমন? কেমন দেখলেন তারাদের? চাঁদকে? প্রশ্ন।

উত্তর দিলেন, সূর্য কী ভীষণ প্রখর! পৃথিবী থেকে দেখা সূর্যের চেয়ে হয়তো শতগুণ প্রখর। তারারাও প্রখর, ঘোর কালো মহাকাশের পর্দ্দায় তীব্র, উজ্জ্বল হীরের মতন।

—চাঁদ?

—দুর্ভাগ্য, চাঁদ আমার দৃষ্টি পথে পড়ে নি!

—ভারহীন অবস্থায় কেমন মনে হোলো? প্রশ্ন করা হোলো।

উত্তর দিলেন, ভারহীন অবস্থার মধ্যে হঠাৎ পড়ি নি। ধীরে ধীরে ভারহীন হয়ে গেলাম। পৃথিবীর অভিকর্ষ যখন বিলুপ্ত হোলো তখন সেকি অদ্ভুত, অপূর্ব্ব অনুভূতি! চারদিকে সব হালকা হয়ে গেছে! এই হাত এই পা এই দেহ সব যেন মনে হচ্ছে এরা আর আমার নয়। বসে আছি না শুয়ে আছি বুঝছি না। মনে হচ্ছে ভেসে রয়েছি। যা কিছু কেবিনের সঙ্গে আটকানো নেই তারাও যেন ভাসছে।

—অসুবিধে হয় নি কোনো ? প্রশ্ন।

উত্তর দেন, অসুবিধে! কই না তো! এর মধ্যে কাজ করেছি। যন্ত্র দিয়ে সঙ্কেত পাঠিয়েছি পৃথিবীতে। কাগজের টুক্‌রোয় লিখেছিও। তবে কাগজখানা ধরে রাখতে হয়েছিল চেপে!

আরও বললেন, চাঁদে বা মঙ্গলে বা মহাকাশের দূর দেশে যাত্রার যত দেরি আছে ভেবেছিলেন তত দেরি নেই!

পার্থিব মানুষ এবার বুঝি পৃথিবীর জন্মক্ষেত্রে যাত্রা শুরু করেছে। জয় হোক মানুষের!

—ঃঃ—